# ভারতের সংবিধান

## প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

# Constitution of India

## Part IV A (Article 51 A)

# Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

* (k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

*Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).*

**(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010). Constitution of India.*

সমাজ বিজ্ঞান

# গণতান্ত্রিক রাজনীতি

## দশম শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যবই


প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

**গণতান্ত্রিক রাজনীতি**

দশম শ্রেণির রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাঠ্যবই

এন সি ই আর টি-র Democratic Politics পাঠ্যপুস্তকের

২০১৮ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

এন সি ই আর টি অনুমোদিত প্রথম বাংলা সংস্করণ-

প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০২০

**প্রচ্ছদ** : এস সি ই আর টি।

**অক্ষর বিন্যাস** : সমীরণ দেবনাথ, শিক্ষক।

**মুদ্রক** : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

**মূল্য**: ৯০ টাকা মাত্র

**প্রকাশক**

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

# ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

**উত্তম কুমার চাকমা**
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

## উপদেষ্টা

১। ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং, এন সি ই আর টি।

২। ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর, এন সি ই আর টি।

## অনুবাদ

১. কমলকুমার ভৌমিক, শিক্ষক

২. ড. মোস্তাফা কামাল, শিক্ষক

৩. কমল দাস, শিক্ষক

৪. পৌলমী চক্রবর্ত্তী, শিক্ষিকা

## পরিমার্জনা

১. বিশ্বনাথ রায়, শিক্ষক

২. এমিলি নাগ, শিক্ষিকা

৩. গৌতম রুদ্র পাল, শিক্ষক

# Foreword

The National Curriculum Framework (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily timetable is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days is actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in Social Sciences, Professor Hari Vasudevan. We also wish to thank the Chief Advisors for this book, Professors Yogendra Yadav and Suhas Palshikar along with Advisor for this book, Professor K. C. Suri for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the

Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairmanship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

*Director*
National Council of Educational
Research and Training

New Delhi
*20 November 2006*

# তোমাদের প্রতি পত্র

**প্রিয় বিদ্যার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকগণ,**

নবম এবং দশম শ্রেণির রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দুটি পাঠ্যবই মিলিতভাবে পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। এজন্যই এদের নাম দিয়েছি গণতান্ত্রিক রাজনীতি-I এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি-II. নবম শ্রেণির রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাঠ্যবইটি আলোচনা যেখানে শেষ করেছে এই বইটিতে সেখান থেকে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। বিগত বছরে গণতন্ত্রের পরিক্রমায় তোমাদেরকে গণতান্ত্রিক নিয়মাবলি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে ও গণতন্ত্র সম্পর্কিত মৌলিক কিছু ধারনার সাথে পরিচয় করানো হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে এই বছর আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু করা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে। এই বইটি কিভাবে গণতন্ত্রে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে কাজ করে এবং গণতন্ত্রের প্রতি আমাদর প্রত্যাশাই বা কি-এই  বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করবে।

আলোচনার এই বিষয়বস্তু পরিবর্তন হওয়ার ফলে তোমরা এখন এই পাঠ্যবইটিতে রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অনেক কিছু জানতে পারবে। রাজনীতি হল মানব সমাজের ঐ সকল চিন্তাধারা যার মাধ্যমে মানুষের সমষ্টিগত জীবন যাপনের পদ্ধতি পরিবর্তন কিংবা নির্দিষ্ট হয়। এই চিন্তাধারাগুলো হল আদর্শ, মতাদর্শ, পারস্পরিক, সংঘর্ষ ও ব্যক্তিস্বার্থ, কিংবা সমষ্টিগত স্বার্থও যুক্ত থাকে। সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলতে সার্বিকভাবে ক্ষমতার অংশীদারিত্বকেই বোঝায়।

উল্লেখিত বিষয়গুলো এই পাঠ্যবইটির প্রথম ছয়টি (৬) অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়গুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রূপের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ও কাঠামোকে আমরা উন্মোচন করব। প্রথম ইউনিটে  প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত ধারনা এবং সরকারের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতা বিভাজনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে দ্বিতীয় ইউনিট গঠন করা হয়েছে যেখানে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধানের উপায়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে তৃতীয় ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এই ইউনিটে আমরা জানতে পারব বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলন গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অপরিহার্য। সপ্তম এবং অষ্টম অধ্যায়ে আমরা মন কতগুলো বৃহত্তর প্রশ্নের অবতারনা করেছি যার মাধ্যমে আমরা বিগত বছরে যাত্রা শুরু করেছিলাম। সুতরাং গণতন্ত্রের এপর্যন্ত সফলতা এবং ভবিষ্যতে যে সকল সফলত সম্ভব সেই সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখান থেকে আমরা শেষ অধ্যায়ের দিকে যাত্রা শুরু করব যেখানে বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং  এগুলো থেকে কীভাবে পরিত্রান পাওয়া যেতে পারে সেই সকল উপায়গুলো সম্পর্কে আলোচন করা হবে। এর মাধ্যমে বিগত বছর থেকে শুরু হওয়া গণতন্ত্রের পরিক্রমা সমাপ্ত হবে। যতই আমরা বিভিন্ন অধ্যায় পরিক্রমা করব, ততই গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বিস্তৃত হতে থাকবে।

এই পাঠ্যবইটি অন্য একটি দিক থেকেও নবম শ্রেণিতে পঠিত পাঠ্য বইটির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। বিগত বছরের পাঠ্য বই এ আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের রচনা শৈলী ও রূপরেখা উদ্ভাবন করা হয়েছিল। পাঠ্য বই এর এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পর আমরা এই বছরেও অনুরূপ অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি। এই বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়কে গল্প, উদাহরন, ধাঁধাঁ এবং ব্যাঙ্গাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করবে। এই বছরে আমরা চাক্ষুষ উপকরনগুলোকে বৃদ্ধি করেছি এবং একটি নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছি, যার নাম হল 'প্লাস বক্স'। 'কিভাবে এই বইটি তোমাকে শুধু গণতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে সাহায্য করবে। তখনি তুমি এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করবে যে এটাই হল গণতন্ত্র সম্পর্কে জানবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে এ বছর দেশের নাম করা রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটিতে অংশগ্রহণ করতে তাদের সম্মতি প্রদান করেছেন। আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার এবং অধ্যাপক হরি বাসু দেবন এর প্রতি যারা পাঠ্য বইটির প্রস্তুতিতে অকৃপন সাহায্য করেছে। আমরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যবেক্ষন কমিটির (National Monitoring Committee) প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটির বিভিন্ন অধ্যায় পর্যবেক্ষন এবং প্রয়োজনীয় মন্তব্যের জন্য আমরা অধ্যাপক সতিশ দেশপান্ডের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এক দল শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ যেমন অনুরাধা সেন, সুমনলত, মনিষ জৈন, রাধিকা মেনন, মালিনী ঘোষ, এলেক্স এম জর্জ এবং পঙ্কজ পুস্কর যারা বইটির খসড়াগুলোকে অধ্যায়ন করে মূল্যবান সুপারিশ মালা প্রদান করেছেন। বিশেষভাবে যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন এলেক্স এবং পঙ্কজ যারা এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে বইটিতে উপস্থাপিত উপকরনগুলো ছিল যথাযথ উৎসাহ ব্যাঞ্জক ও বিষয় উপস্থাপিত উপকরণগুলো ছিল যথাযথ উৎসাহ ব্যাঞ্জক ও বিষয় অনুধাবনে সহায়ক। এই দুই জনকে আমরা বইটির মহান পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করি। বইটির আকর্ষনীয় অবয়বে অবদান রেখেছেন পার্থিব শা এবং শ্রুবনি আগের মতই উন্মি এর মুন্মির চরিত্র দুটিকে নতুনরূপে উপস্থাপন করেছেন ইরফান খান। এ আর কে গ্রাফিক্সের আহমেদ দ্বারা সমৃন্ধ করেছে। আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ লোকনীতি এবং সি.এস.ডি.এস. এর প্রতি (Center for the study of Developing Societies) যারা পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটিকে প্রয়োজনীয় জায়গা, পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে বিগত দুই বছর ধরে ক্রমাগত সাহায্য করে আসছেন।

এই অধ্যায়ন বছরের শেষে তোমরা বোর্ড পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে তোমাদের সকলের প্রতি পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য আমাদের শুভ কামনা রইল। আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা হল এই যে বিগত দুই বছর ধরে গণতন্ত্র সম্পর্কে তোমাদের অধ্যয়ন পরিক্রমার শেষে দুটি সাধারণ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া থেকে তোমরা বেড়িয়ে আসবে। যেমন- রাষ্ট্র বিজ্ঞান অধ্যয়ন অত্যন্ত একপেশে এবং বিরক্তি কর। আমাদের আশা, গণতান্ত্রিক রাজনীতির উপর গভীর এবং ভারসাম্যমূলক অধ্যয়নে তোমার আগ্রহ আবশ্যই বজায় থাকবে; আর তা হতে পারে রাষ্ট্র বিজ্ঞানকে তোমার ভবিষ্য অধ্যায়নের বিষয় হিসাবে বেছে নেওয়া অথবা সমাজে নিজেকে দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে।

কে.সি শূরী
*উপদেষ্টা*

যোগেন্দ্র যাদব, সুহাস পালসিকর
*প্রধান উপদেষ্টাদ্বয়*

# কীভাবে বইটি ব্যবহার করা যাবে

এই বইটিতে তোমাদের পরিচিত অনেক বৈশিষ্ট্যই বজায় রাখা হয়েছে। এই বৈশিষ্টগুলো চালু হয়েছিল নবম শ্রেণির রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাঠ্যবইটিতে। এই পাঠ্যবইটিতে এমন কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাইবে।

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এই বইটির প্রত্যেকটি অধ্যায় একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এখানে তোমরা অধ্যায়গুলোর উদ্দেশ্য এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। প্রতিটি অধ্যায় অধ্যায়নের পূর্বেও পরে সংক্ষিপ্ত বিবরণীটি পড়লে তোমরা উপকৃত হবে।

**অনুচ্ছেদ ও উপঅনুচ্ছেদের অন্তর্গত বিভিন্ন শিরোনামের সংযোজন ঃ**
প্রতিটি অধ্যায়ে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম ঐ পৃষ্টায় দুটি কলাম জুড়ে বিস্তৃত। এর দ্বারা এটা বোঝা যায় যে অধ্যায়ের একটি বিশেষ পাঠ্যাংশ এখান থেকে শুরু হয়েছে। উপ অনুচ্ছেদের শিরোনাম একটি মাত্র কলাম জুড়ে থাকে। যাতে বোঝা যায় যে, এ অংশটি হল অনুচ্ছেদের অন্তর্গত বিষয়টির একটি উপ অংশ।

**গ্রাফিক্স, কোলাজ, চিত্র এবং প্রচার পত্রের সংযোজন ঃ** নবম শ্রেণির পাঠ্যবই এই তুলনায় এই বইটিতে উল্লেখিত উপকরণগুলো বেশি করে জায়গা নিয়েছে। তুমি প্রায়ই পৃষ্টার বড় অংশ জুড়ে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র দেখতে পাবে। এই চিত্রগুলো তোমার চোখে আকর্ষনীয় ভাবে দৃশ্যমান হবে। এই চিত্রগুলো শুধুমাত্র দেখেই পৃষ্টা উল্টানো ঠিক হবে না। তোমরা এই চিত্রগুলোর অর্থ পড় এবং তার আভ্যন্তরীন তাৎপর্য্য অনুধাবনের চেস্টা করবে। তোমরা প্রায়ই দেখতে পাবে যে রাজনীতি শুধুমাত্র বক্তৃতা দ্বারাই প্রকাশ পায় না বরং চিত্র দ্বারাই অধিক প্রকাশ পেতে পারে। বিভিন্ন শিরোনাম এবং যুক্ত প্রশ্নের সাহায্যে তুমি চিত্রগুলো দ্বারা বর্ণিত বিষয়গুলোকে গভীরভাবে জানতে পারবে।

**মুন্নি এবং উন্নি ঃ** এ দুটি চরিত্র তোমাদের কাছে আবার ফিরে এসেছে। নবম শ্রেণিতে এই দুটি চরিত্রের সাথে তোমাদের পরিচয় ঘটেছে। তখন থেকে তোমাদের মত তারাও একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে। ক্রমাগতভাবে তারা উঁকি মেরে থাকে এবং তোমাদের মনের প্রশ্নগুলো তারাই করে ফেলে। উন্নি মুন্নির ..... প্রশ্নগুলোর সাথে তোমরা সরাসরি যুক্ত নাও থাকতে পারো। তবে তোমার শিক্ষক শিক্ষিকা কিংবা পিতা মাতার কাছে অনুরুপ প্রশ্ন করতে কখনও পিছপা হবে না।

**প্লাস বক্সগুলি ঃ** এই বাক্সগুলোর মধ্যে অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সম্পূরক তথ্যগুলো থাকে। কখনো কখনো এই প্লাস বাক্সগুলো এমন কিছু ঘটনার বর্ণনা করে যা তোমাদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোর সাথে যুক্ত উভয় সংকটগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে সাহায্য করবে। এগুলো তোমরা পড়বে ও আলোচনা করবে। প্লাস বাক্সগুলোতে থাক বিষয় ও তথ্য গুলোকে মুখস্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। আলোচ্য অংশে নিহিত নীতিগত প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরও এই বাক্সগুলোতে নেই। এগুলো শুধু বিষয়ের উপর গভীর চিন্তা করতে তোমাদের সাহায্য করবে। প্রত্যেকটি প্লাস বাক্সতে একটি বিশেষ + চিহ্ন থাকে।

**চলো টেলিভিশন দেখি, চলো রেডিও বার্তা শুনি, চলো খবরের কাগজ পড়ি, চলো বিতর্ক করি, চলো খুঁজে বের করি অথবা চলো এটা করি—** এই আহ্বানগুলো বিদ্যার্থীদের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কিংবা বাইরে বিষয়ের উপর চর্চা করতে সাহায্য করে। এই চর্চাগুলো আরও বেশি অর্থবহ হয় তখন যখন বিদ্যার্থীরা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত বিষয়গুলো পুরো শ্রেণিকক্ষের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ এবং এগুলোর উপরে আলোচন করার অবকাশ পায়। প্রয়োজন অনুসারে গণমাধ্যমকে অন্য গণমাধ্যম দ্বারা পরিবর্তন করতে শঙ্কাবোধ করবে না।

**টীকা ঃ**

**টীকা ঃ** পাঠ্যবই এর ৩য় পৃষ্টার প্রান্তে অপরিচিত শব্দ কিংবা বর্ণনাগুলো টীকা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। পাঠ্যবইয়ে কিছু শব্দ পাঠকের দৃষ্টি গোচরের স্বার্থে পূর্ণ উজ্জ্বল করে রাখা হয়। মনে রেখো এগুলোর সংজ্ঞা পূর্ণ হৃদয় দিয়ে শিখবার প্রয়োজন নেই। শব্দগুলোর শুধু অর্থ বুঝলেই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

**এই অংশটি সাধারণত** প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে যুক্ত হয়। এখানে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো অধ্যায়নের বিশেষ প্রেক্ষাপটে তোমাদেরকে অর্জিত শিক্ষনগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে। শিক্ষকগণ পাঠে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি আরও অনেক আনুসঙ্গিক প্রশ্ন ব্যবহার করতে পারে যার সাহয্যে তোমাদের প্রত্যেকের অগ্রগতি যাচাই করা যাবে।

**অনুশীলনী**

**অনুশীলনী ঃ** প্রত্যেক অধ্যায়ের একেবারে শেষের দিকে অনুশীলনী যুক্ত হয়। তোমরা ইতি মধ্যেই লক্ষ করেছ যে আমরা নতুন আঙ্গিকে অনুশীলনীগুলোকে সাজানোর চেস্টা করেছি। বিশেষ করে যে সকল প্রশ্নের কয়েকটি বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে এবং সঠিক উত্তরটি বাছাই করতে হয় সেক্ষেত্রে মনস্তাত্বিক ও যুক্তিগত সামর্থ্যের প্রয়োজন। যখন একাধিক পছন্দের প্রশ্নগুলোর সাথে একবার পরিচিত হবে তখন এর সঠিক উত্তর অনুসন্ধানে তোমরা আরও বেশি আগ্রহী হবে।

**মানচিত্র ঃ** শুধুমাত্র ভূগোল সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রেই মানচিত্রের প্রয়োজন হয় না বরং রাজনীতি এবং ইতিহাস জানার ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজন হয়। আর এ কারণেই এ পাঠ্য বই এ বেশ কিছু তথ্যকে মানচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। তোমাদের মানচিত্র অঙ্কন করার প্রয়োজন নেই বরং প্রদত্ত মানচিত্রটি যে কারনে এবং যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি অনুধাবন করার চেস্টা কর।

# Textbook Development Committee

**Chairperson, Advisory Committee for Textbooks at the Secondary Level**

Hari Vasudevan, *Professor*, Department History, University of Calcutta, Kolkata

**Chief Advisors**

Yogendra Yadav, *Senior Fellow*, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

Suhas Palshikar, *Professor*, Department of Politics and Public Administration, University of Pune, Pune

**Advisor**

K. C. Suri, *Professor*, Department of Political Science, University of Hyderabad, Hyderabad

## Members

Sanjyot Apte, *Senior Lecturer*, Department of Politics, S. P. College, Pune

Rajeev Bhargava, *Senior Fellow*, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

Peter R. deSouza, *Senior Fellow*, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

Alex M. George, *Independent Researcher*, Eruvatty, District Kannur, Kerala

Malini Ghose, Nirantar, Center for Gender and Education, New Delhi

Manish Jain, *Researcher*, University of Delhi, Delhi

Suman Lata, *Senior Lecturer,* Department of Education, Gargi College, University of Delhi, Delhi

Pratap Bhanu Mehta, *President and Chief Executive*, Center for Policy Research, New Delhi

Nivedita Menon, *Reader*, Department of Political Science, Faculty of Arts, University of Delhi, Delhi

Radhika Menon, *Lecturer*, Department of Education, Mata Sunderi College, University of Delhi, Delhi

Sanjeeb Mukherjee, *Senior Lecturer*, Department of Political Science, Calcutta University, Kolkata

Priyavadan Patel, *Professor*, Department of Political Science, M. S. University, Vadodara

Malla V. S. V. Prasad, *Lecturer*, DESSH, NCERT, New Delhi

Pankaj Pushkar, *Senior Lecturer,* Lokniti, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

Madan Lal Sawhney, *PGT* (Pol. Sc.), Govt. Sr. Sec. School, Sec. VII, R.K. Puram, New Delhi

Anuradha Sen, *Principal*, The Srijan School, Model Town III, Delhi

Meenakshi Tandon, *PGT* (Pol. Sc.), Sardar Patel Vidyalaya, Lodhi Road, New Delhi

## Coordinator

Sanjay Dubey, *Reader*, DESSH, NCERT, New Delhi

# Acknowledgements

Maps, photographs, posters, graphics and cartoons for this book are drawn from a variety of sources. We gratefully acknowledge the following institutions and persons (with their institutional affiliation) in this regard:

Wikipedia for the map on page 2 and for the photographs on pages 4, 5, 30 and 64, which are available under GNU license.

ARK Grafix for the maps on pages 3 and 14 and for the graphics on pages 45, 50 and 82.

UNFPA for the map on page 43.

Flikr for the use of the photograph on page 36, under '*Creative Commons*'.

Min Bajracharya for the photographs on pages 58 and 59.

*The Hindu* for the photographs on pages 72 and 75.

Anhad/NCDHR for the posters on pages 33 and 54; and Anhad for the two posters on pages 46 and 65.

Zuban for generous help in searching several precious posters, including the ones on pages 40, 41 and 76.

Oxfam GB for the poster on page 44; Voluntary Health Association of India for the one on page 48; and APDP for the poster on page 65.

Oxford University Press and Raza/ARK for the graphics on pages 78, 92 and 98, which are taken from the *Report on the State of Democracy in South Asia*.

Ajit Ninan of *Times of India* for the cartoons on pages 21, 49 and 53; Keshav of *The Hindu* for the cartoons on pages 62 and 86; Kutty for the cartoon on page 21; Manjul of *DNA* for the one on page 85; Surendra of *The Hindu* for the cartoons on pages 45 and 66; Cagle Cartoons for the cartoons on pages 6, 8, 32, 37, 68, 79, 83, 84, 91, 93-98, 103 and 111; R.K. Laxman of *Times of India* for the cartoons on pages 73 and 90; and Irfaan Khan for the cartoon on page 110.

Irfaan Khan, Yesudasan and R.K. Laxman for the cartoons on the Cover page. Zuban, INSAF (Delhi), SAHMAT, Street Art Workers.com, Oxfam GB, Aalochana (Pune), Chandralekha (Chennai), Nari Nirjatan Pratirodh Manch (West Bangal), Sakhi (Kerala), Institute of Development Communication (Chandigarh), Sahiyar (Gujarat), Sheba Chhachhi for the posters on back cover.

We thank Uttam Kumar and Ritu Sharma, both DTP operators at the NCERT, for their sincere efforts in making this book error-free. We also thank Devyani Oniyal and Deepti Sharma of NCERT for copy-editing the book.

**REQUEST FOR FEEDBACK**

How did you like this textbook? What was your experience in reading or using this? What were the difficulties you faced? What changes would you like to see in the next version of this book? Write to us on all these and any other matter related to this textbook. You could be a teacher, a parent, a student or just a general reader. We value any and every feedback.

Please write to:
Coordinator (Political Science)
Department of Education in Social Sciences (DESS)
NCERT
Sri Aurobindo Marg, New Delhi 110 016.

# সূচিপত্র


প্রাক্কথন

তোমাদের প্রতি পত্র

কীভাবে বইটি ব্যবহার করা যাবে

একক – ১

*প্রথম অধ্যায়*

ক্ষমতার অংশীদারিত্ব 1

*দ্বিতীয় অধ্যায়*

গণতন্ত্র কী ? গণতন্ত্র কেন ? 13

একক – ২

*তৃতীয় অধ্যায়*

গণতন্ত্র ও বৈচিত্রতা 29

*চতুর্থ অধ্যায়*

লিঙ্গ, ধর্ম এবং জাতি 39

একক – ৩

*পঞ্চম অধ্যায়*

গণসংগ্রাম ও আন্দোলন 57

*ষষ্ঠ অধ্যায়*

রাজনৈতিক দল 71

একক – ৪

*সপ্তম অধ্যায়*

রাজনৈতিক দল 89

*অষ্টম অধ্যায়*

গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ 101

# ক্ষমতার - অংশীদারিত্ব
# Power-sharing

অধ্যায়-১

## সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Overview)

এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আমরা গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু করছি, যদিও এর সূচনা হয়েছিল বিগত বছর থেকে। গত বছরে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার সকল উৎস সরকারের একটিমাত্র শাখায় সীমাবদ্ধ থাকে না। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সুষমবণ্টন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রূপায়ণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এবং পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা ক্ষমতা বণ্টনজনিত ধারণাকে শ্রীলঙ্কা ও বেলজিয়ামের দু'টি ঘটনা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব। দু'টি ঘটনাই ক্ষমতা বণ্টন সম্পর্কিত দাবিগুলোকে কীভাবে মীমাংসা করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করবে। ঘটনাগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একই ধরনের গ্রহণযোগ্য একটি স্বাভাবিক উপসংহারে উপনীত হতে সহায়ক হবে। এটি আমাদের পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে ক্ষমতা বণ্টনের বিভিন্ন রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

# বেলজিয়াম ও শ্রীলঙ্কা Belgium and Sri Lanka

বেলজিয়াম হল ইউরোপের ছোটো একটি দেশ। আয়তনে এটি আমাদের হরিয়ানা রাজ্যের থেকেও ছোটো। এর সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলো হল,ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস, জার্মানি এবং লুক্সেমবুর্গ। এর মোট জনসংখ্যা এক কোটি থেকে সামান্য বেশি, যা আমাদের হরিয়ানার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এই ছোটো দেশটির জাতিগত জনসংখ্যার অনুপাত অত্যন্ত জটিল। দেশটির মোট জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ ফ্লেমিস অঞ্চলে বসবাস করে এবং ডাচ ভাষায় কথা বলে। অপরদিকে প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ যারা মূলত ফরাসি ভাষায় কথা বলে তারা ওয়ালোনিয়া অঞ্চলে বসবাস করে। অবশিষ্ট ১ শতাংশ মানুষ জার্মান ভাষাভাষী। আবার রাজধানী শহর ব্রাসেলসে ৮০ শতাংশ লোক ফরাসি এবং ২০ শতাংশ লোক ডাচ ভাষায় কথা বলে।

ফরাসি ভাষাভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে বিত্তশালী এবং ক্ষমতাবান। এর ফলে ডাচ ভাষাভাষী সম্প্রদায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ, কারণ তুলনামূলকভাবে এরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের সুবিধাগুলো দেরিতে অর্জন করেছে।

এই বিষয়টি ১৯৫০ এবং ১৯৬০এর দশকে ফরাসি এবং ডাচ ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনাহূত উত্তেজনা সৃষ্টি করে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার এই বিবাদটি রাজধানী ব্রাসেলসে প্রবলভাবে দেখা দেয়। ব্রাসেলসও অন্য একটি বিশেষ সমস্যায় জর্জরিত। তাহলো সারা দেশে ডাচ ভাষাভাষী জনগণ সংখ্যাগুরু হলেও রাজধানীতে তারা সংখ্যালঘু।

চলো, এই সমস্যাটি অন্য একটি দেশের সমস্যার সাথে তুলনা করি। শ্রীলঙ্কা একটি দ্বীপরাষ্ট্র যা ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চল থেকে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এর জনসংখ্যা ২ কোটি যা আমাদের হরিয়ানা রাজ্যের সমান। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা ও অত্যন্ত বৈচিত্রময়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীগুলো হল সিংহল ভাষাভাষী (৭৪শতাংশ) এবং তামিল ভাষাভাষী হল (১৮ শতাংশ)। তামিল ভাষাভাষী লোকেরা আবার দুইটি উপদলে বিভক্ত।

আমার মনের একটি সাধারণ সমীকরণ হল-
ক্ষমতা বণ্টন =
ক্ষমতা বিভাজন = দুর্বল রাষ্ট্র।
আমরা এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলা শুরু করেছি কেন?

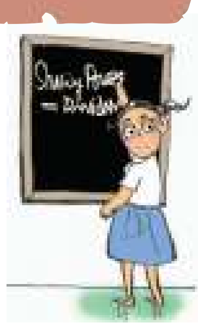

## টীকা

জাতিগত : সম সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটি সামাজিক সম্প্রদায়। এর অন্তর্ভুক্ত জনগণ সম অবয়ব ও সংস্কৃতির কারণে বংশ পরম্পরায় বিশ্বাস করে। তবে এদের সকলে সব সময় একই ধর্ম কিংবা জাতিসত্বার অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে।

### বেলজিয়ামের অঞ্চল ও সম্প্রদায় সমূহ

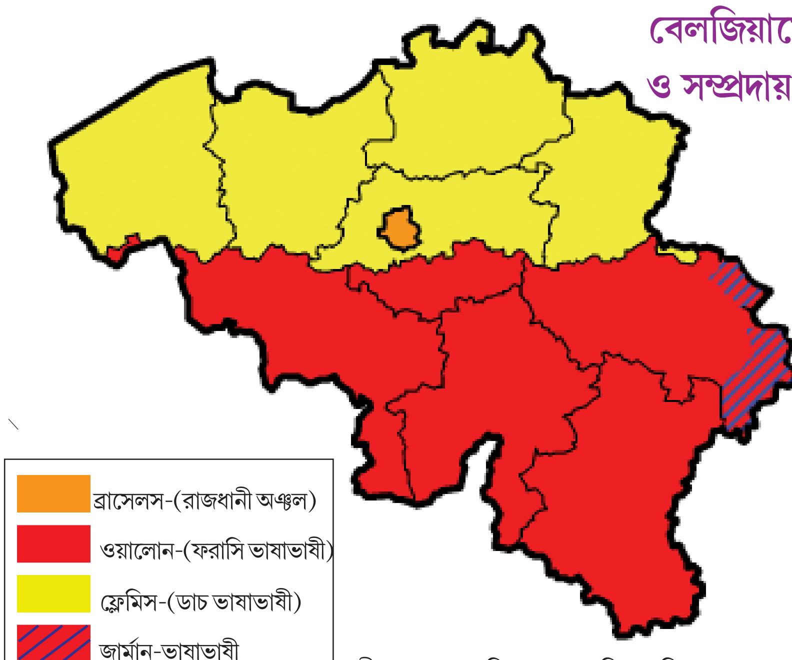


শ্রীলঙ্কা ও বেলজিয়ামের মানচিত্রের দিকে তাকাও। কোন কোন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অধিক পরিমাণে বসবাস করছে বলে তুমি মনে কর?

দেশের স্থানীয় তামিলদের 'সিংহলি তামিল' বলা হয় (১৩ শতাংশ)। আর যাদের পূর্বপুরুষরা ঔপনিবেশিক সময়ে বাগান শ্রমিক হিসাবে ভারত থেকে এসেছে তাদেরকে বলা হয় 'ভারতীয় তামিল'। মানচিত্রে তোমরা দেখতে পাবে যে সিংহলি তামিলরা দেশটির উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের প্রধান অধিবাসী। বেশিরভাগ সিংহলি ভাষাভাষী জনগণ বুদ্ধধর্মে বিশ্বাস করে এবং তামিলদের বেশিরভাগই হল হিন্দু অথবা মুসলিম। দেশটির মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশ হল খ্রিস্টান, যাদের মধ্যে তামিল এবং সিংহলি উভয় সম্প্রদাযের লোকই অন্তর্ভুক্ত।

কল্পনা কর এরকম পরিস্থিতিতে ঐ দেশগুলোতে কী হতে পারত। বেলজিয়ামে সংখ্যাগত আধিক্যের কারণে ডাচ সম্প্রদায় বিভিন্ন সুবিধা নিতে পারত এবং নিজেদের অভিলাশ ফরাসি ও জার্মান ভাষাভাষী লোকেদের উপর চাপিয়ে দিতে পারত। এই অবস্থা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারত। যার ফলে দেশটি বিশ্রীভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ত এবং বিবাদমান উভয়গোষ্ঠি রাজধানী শহর ব্রাসেলস নিয়ন্ত্রণের দাবী করত। শ্রীলঙ্কায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলি সম্প্রদায় সমগ্র দেশেই নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চাপিয়ে দিতে পারত। চলো এখন আমরা দেখি এই দুটি দেশেই আসলে কী ঘটে ছিল।

## শ্রীলঙ্কার আধিপত্যবাদ
## (Majoritarianism in Sri Lanka)

১৯৪৮ সালে শ্রীলঙ্কা একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে আবির্ভূত হয়। সংখ্যাগত আধিক্যের কারণে সিংহলি সম্প্রদায় নতুন সরকারের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার প্রচেস্টা চালায়। ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নতুন সরকার সিংহলি সম্প্রদায়ের সপক্ষে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৫৬ সালে পাশ হওয়া একটি আইনের দ্বারা কেবল সিংহলি ভাষাকে দেশের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই আইনের দ্বারা তামিল ভাষাকে অমর্যাদা করা হয়। সরকারি চাকরি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও সিংহলি ভাষাগোষ্ঠীর প্রার্থীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। নতুন সংবিধানে সুস্পস্টভাবে বলা হয় রাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

এইভাবে সরকারের একের পর এক বৈষম্যমূলক পদক্ষেপের ফলে তামিল ভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়। তারা লক্ষ করে, দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সিংহলি বৌদ্ধদের নেতৃত্বাধীন, আর এই দলগুলো নিজেদের ভাষা সংস্কৃতির ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী। এরফলে তামিল সম্প্রদায় মনে করে যে সাধারণ ও সরকারি নীতি তাদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে।

**শ্রীলঙ্কার জাতিগত সম্প্রদায়সমূহ**

### টীকা

**সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদ:** একধরনের বিশ্বাস যেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছামত পন্থায় দেশ শাসন করে।

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় দেশ শাসন করলে সমস্যা কী? সিংহলিরা যদি শ্রীলঙ্কায় শাসন না করতে পারে তাহলে কোথায় করবে?

কালক্রমে সিংহলি এবং তামিল ভাষাগোষ্ঠির মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি হয়।

পাল্টা হিসাবে তামিলরা রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং তামিল ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগের দাবিও তোলে। কিন্তু তামিলভাষী রাজ্যগুলোতে স্বশাসনের দাবি বারবার শ্রীলঙ্কা সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হয়। ১৯৮০-এর দশকে শ্রীলঙ্কার উত্তর এবং পূর্ব দিকে স্বাধীন তামিল ইলম (স্বাধীন তামিল রাজ্য) গঠনের দাবিতে একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে।

স্বাধীন তামিল রাজ্য গঠনের জন্য সংগ্রাম শুরু হয়। সেই সংগ্রামের ফলে দুটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সংঘর্ষের রূপ নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। উভয় জাতিগোষ্ঠির হাজার হাজার মানুষ এই গৃহযুদ্ধে নিহত হয়। বহু পরিবার উদ্‌বাস্তু হিসেবে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। বহু লোক রুজি রোজগার হারান। দশম শ্রেণির অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে তুমি ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সার্বিক সমৃদ্ধিতে শ্রীলঙ্কার অসাধারণ কৃতিত্ব সম্পর্কে পড়েছ। কিন্তু গৃহযুদ্ধের ফলে দেশটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে ভয়ানক অন্ধকার নেমে আসে। ২০০৯ সালে এই বিভীষিকার অবসান ঘটে।

## বেলজিয়ামে সমন্বয় সাধন
## (Accommodation in Belgium)

এই সমস্যা নিরসনে বেলজিয়ামের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভিন্ন একটি উপায় অবলম্বন করেন। তারা দেশের আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের উপস্থিতি স্বীকার করে নেয়। ১৯৭০-১৯৯৩ সালের মধ্যে দেশটির সংবিধান চারবার সংশোধিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধন করা। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যে সমন্বয় সাধনের এই পন্থাটি ছিল অন্যান্য দেশ থেকে আলাদা ও অভিনব। বেলজিয়ামে গৃহীত সমন্বয়ের এই আদর্শটির বিভিন্ন উপকরণ এখানে ব্যাখ্যা করা হল।

- সংবিধান অনুসারে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারে ডাচ এবং ফরাসি ভাষাভাষী মন্ত্রীর সংখ্যা হবে সমান। বিশেষ কিছু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন অপরিহার্য। সুতরাং এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কোনো ভাষাগোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায় এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।
- কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক ক্ষমতা দুটি অঞ্চলের প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ততা থেকে মুক্ত।
- রাজধানী ব্রাসেলস শহরের জন্য আলাদা সরকার রয়েছে। যেখানে দুটি সম্প্রদায়ের সমান প্রতিনিধিত্ব বর্তমান। ডাচ্ ভাষাভাষী জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারে সমপ্রতিনিধিত্ব মেনে নেওয়ার কারণে ফরাসি ভাষার জনগণও ব্রাসেলস্-এ সমপ্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে নেয়।

### টীকা

গৃহযুদ্ধ : এক ধরনের সশস্ত্র সংঘর্ষ যা একই দেশে বসবাসকারী বিবাদমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংগঠিত হয়। এই সংঘর্ষ এতটাই মারাত্মক যে একে দেখলে যুদ্ধের মত মনে হয়।

© Wikipedia

উপরের চিত্রটি বেলজিয়ামের একটি রাস্তার ঠিকানা। তুমি লক্ষ করবে যে, রাস্তাটির নাম ও দিক নির্দেশনা ফরাসি এবং ডাচ উভয় ভাষাতেই লেখা রয়েছে।

এটা কী ধরনের সমাধান? আমার কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার যে, আমাদের সংবিধান কখনোই এটা ঠিক করে দেয় না যে, কোন্ মন্ত্রী কোন্ সম্প্রদায় থেকে হবেন।

● বেলজিয়ামে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকার ছাড়াও একটি তৃতীয় সরকার রয়েছে। এর নাম 'কমিউনিটি সরকার'। যা একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হয়। যেখানেই বসবাস করুক না কেন ডাচ, ফরাসি এবং জার্মান ভাষাভাষী সকল গোষ্ঠীরই একটি 'কমিউনিটি সরকার' রয়েছে। সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ভাষা সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এই সরকারের হাতে ন্যস্ত।

বেলজিয়ামের এই চিত্রটি তোমার কাছে জটিল মনে হবে। বেলজিয়ামের মানুষেরাও এই চিত্রটিকে খুব জটিল মনে করে। তবে সমন্বয় সাধনের এই চিত্রটি সেখানে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি দুটি ভাষাগত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে নাগরিক সংঘর্ষ এড়াতে সাহায্য করেছে এবং দেশটিকে সম্ভাব্য ভাষাগত বিভাজন থেকেও রক্ষা করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র যখন মিলিত হয়ে সংযুক্ত ইউরোপ গঠনে সচেষ্ট হয়েছে তখন ব্রাসেলসকে তার প্রধান কার্যালয় হিসাবে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছে।

*বেলজিয়ামে অবস্থিত ইউরোপীয় সংসদ*

সুতরাং তুমি বলছ যে ক্ষমতার অংশিদারিত্ব আমাদেরকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তুলে। আমার কাছে এটা অদ্ভুত মনে হয়। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

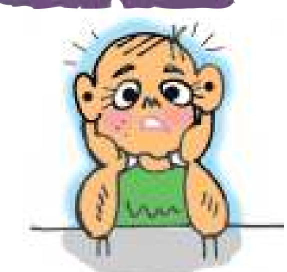

*এক সপ্তাহ ধরে সংবাদপত্র পাঠ করে চলমান যুদ্ধ ও সংঘর্ষ সম্পর্কিত খবরগুলো সংগ্রহ কর। পাঁচজন বিদ্যার্থীর একটি দল সংগৃহীত সংবাদগুলোকে একত্র করে নিম্নলিখিত পন্থায় চর্চা কর:*

● স্থানভেদে সংবাদগুলোর শ্রেণিবিভাগ কর। (তোমার রাজ্য, ভারতবর্ষ এবং ভারত বর্হিভূত)

● প্রত্যেকটি সংঘর্ষের কারণ খুঁজে বের কর । এর মধ্যে কোনগুলো ক্ষমতার অংশিদারিত্বের সাথে সম্পর্কিত?

● এর মধ্যে কোন্ সংঘর্ষগুলো ক্ষমতার অংশিদারিত্বের সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাধান করা যায়?

বেলজিয়াম এবং শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে তুমি কী শিখেছ? দুটোই গণতান্ত্রিক দেশ। যদিও তারা ক্ষমতার অংশিদারিত্ব সম্পর্কিত সমস্যাটি ভিন্নভাবে সমাধান করেছে। বেলজিয়ামের নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে বিভিন্ন অঞ্চল এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সংবেদনশীলতাকে মর্যাদা দেওয়ার মাধ্যমেই দেশের বৃহত্তর ঐক্য গঠন করা সম্ভব। এধরনের সদর্থক অনুভূতির ফলশ্রুতি হল সর্বজনগ্রাহ্য ক্ষমতা বন্টনের সুষম ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা আমাদের সামনে বিপরীতধর্মী একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছে। যদি কোনো সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বলপূর্বকভাবে অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের সাথে ক্ষমতার অংশিদারিত্ব অস্বীকার করে তখন দেশের শান্তি ও ঐক্য বিনষ্ট হয়।

জার্মানের সুন্দর কারিগরিতা

*বাম পাশের ব্যাঙ্গচিত্রটি জার্মানির জোট সরকারের বিভিন্ন সমস্যাকে তুলে ধরেছে। এই জোটে খ্রিস্টান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন এবং সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে দুটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল যুক্ত রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে দুটি দলই পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। ২০০৫ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েই দুটি দল জোট গঠনে বাধ্য হয়েছে। নীতি প্রণয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা প্রায়ই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। এ অবস্থাতেও তারা যৌথভাবে সরকার পরিচালনা করেছে।*

## ক্ষমতার অংশিদারিত্ব কেন প্রত্যাশিত?

## Why power sharing is desirable?

ক্ষমতার অংশিদারিত্বের সপক্ষে দুটি কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি হল এটা একটা উত্তম পন্থা কারণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠির মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষ হ্রাস করা যায়। যেহেতু সামাজিক বিবাদ কখনো কখনো সশস্ত্র সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়, সেক্ষেত্রে ক্ষমতার অংশিদারিত্বই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ইচ্ছাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি যদিও সাময়িকভাবে আকর্ষণীয় মনে হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় দ্বারা সৃষ্ট স্বৈরতান্ত্রিকতা শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যই বিপর্যয় বয়ে আনে না, কখনো কখনো ধ্বংসের পথেও ঠেলে দেয়।

ক্ষমতার অংশিদারিত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে যে হিতকর তার একটা দ্বিতীয় অন্তর্নির্হিত কারণ আছে। গণতন্ত্রের অন্যতম আদর্শ হল ক্ষমতার অংশিদারিত্ব। গণতান্ত্রিক শাসন হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে এর দ্বারা প্রভাবিত লোকেদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। দেশের শাসন পদ্ধতি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে। একটি বৈধ সরকার তখনি গঠিত হয় যখন এতে জনগণ অংশগ্রহণ করে এবং শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের অংশিদার মনে করে।

এখানে প্রথমটিকে আইনগত (বা বিবেচনা প্রসূত) এবং দ্বিতীয়টিকে নীতিগত কারণ বলা যেতে পারে। ক্ষমতার অংশিদারিত্বের সপক্ষে বর্ণিত আইনগত কারণটি জনকল্যাণের ক্ষেত্রটিকে উপস্থাপন করে এবং নীতিগত কারণটি তার মূল্যবোধকে প্রকাশ করে।

### টীকা

আইনগত বা বিবেচনা প্রসূত: এটি বিচক্ষণতা বা দূরদর্শিতা নির্ভর। অথবা যা লাভ কিংবা ক্ষতির সযত্ন হিসাব নিকাশের ভিত্তির উপর গড়ে উঠে। সাধারণত বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তগুলো নীতিগত সিদ্ধান্তের বিপরীতে গড়ে উঠে।

এনিট্টি বেলজিয়ামের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি ডাচ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করে। এই স্কুলে অধ্যয়ণরত ফরাসি ভাষাভাষি বিদ্যার্থীরা চায় বিদ্যালয়টির পড়াশোনার মাধ্যম হউক ফরাসি। আবার শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলের একটি স্কুলে পড়াশোনা করে সেলভি নামের একটি মেয়ে। সেলভি নিজে সিংহলি হলেও স্কুলের বাকি শিক্ষার্থীরা হল তামিলভাষী, যারা তামিল ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে দেখতে আগ্রহী।

● যদি এনেট্টি এবং সেলভির অভিভাবকগণ নিজ নিজ সরকারের কাছে তাদের সন্তানদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করে তাহলে কে জিতবে বলে তোমার মনে হয়? এবং কেন?

# খলিলের উভয় সংকট

*অভ্যাসগত ভেটলকে পেছনে বসিয়ে বিক্রম নিরবে মোটর সাইকেলটি চালিয়ে যাচ্ছে। মোটর সাইকেলটি চালানোর সময় বিক্রম যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে সেজন্য ভেটল অন্যদিনের মতই একটি গল্প বলতে শুরু করল। এবারের গল্পটি এরকম :*

বৈরুত শহরে খলিল নামের এক ব্যক্তি বসবাস করত, তার মাতা-পিতা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের।বাবা ছিলেন গোড়া খ্রিস্টান এবং মা সুন্নি মুসলমান। বড় বড় আধুনিক শহরে এ-ব্যাপারটি খুব বেশি অদ্ভুত নয়। লেবাননের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজধানী শহর বৈরুতে এসে বসবাস করতে শুরু করে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের হলেও তারা সম্প্রীতির সাথে বসবাস করত। যদিও পরবর্তীতে তারা নিজেদের মধ্যেই ভয়ানক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই গৃহযুদ্ধে খলিলের এক কাকা নিহত হয়।

গৃহযুদ্ধের শেষে লেবাননের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন সম্পর্কিত কিছু সর্বজনগ্রাহ্য মৌলিক নিয়ম কানুনের ভিত্তি স্থাপনে ঐক্যমত পোষণ করে। নতুন নিয়ম অনুসারে দেশটির রাষ্ট্রপতি হবেন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে এবং প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন সুন্নি মুসলমান। উপপ্রধানমন্ত্রী একজন গোড়া খ্রিস্টান এবং সংসদের অধ্যক্ষ হবেন শিয়া মুসলিম। চুক্তি অনুসারে খ্রিস্টানরা ফ্রান্সের কাছে নিরাপত্তা চাইবে না এবং মুসলিমরা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সিরিয়ার প্রতি একপেশে আনুগত্য প্রকাশ করবে না। এই চুক্তির সময়কালে লেবাননে খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। দু'পক্ষই এই চুক্তিকে সম্মান করে আসছে, যদিও বর্তমানে দেশটিতে মুসলমানদের প্রাধান্য বেশি।

এই ব্যবস্থাটি খলিলের মোটেই পছন্দ নয়, সে রাজনৈতিকভাবে উচ্চাভিলাষী এবং জনপ্রিয়। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় তারপক্ষে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়া অসম্ভব। সে তার বাবা মা কারোর ধর্মই অনুসরণ করেনা। সে মুসলিম কিংবা খ্রিস্টান পরিচয় নিয়ে বড় হতে চায় না। লেবানন কেন অন্য একটি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক দেশের মত হতে পারবে না, এব্যাপারটি সে বুঝতে পারে না। "একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হউক, প্রত্যেক নাগরিকই যোগ্যতা অনুসারে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক, যে সর্বাধিক ভোট পাবে সেই রাষ্ট্রপতি হবে, সে কোন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের এটা বিবেচ্য বিষয় হবে না। তার প্রশ্ন পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত আমরা কেন হতে পারব না? রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষকারী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাকে বলেন যে বর্তমান ব্যবস্থা স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরী....।"

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। এতক্ষণে তারা টিভি টাওয়ারের কাছে পৌঁছে গেল। প্রতিদিন এখানেই তারা থামে। মোটর সাইকেল থেকে অবতরণ করে অন্যদিনের মতই ভেটল প্রশ্ন করে।

বিক্রম : "লেবাননের আইন পরিবর্তন করার ক্ষমতা যদি তোমার হাতে থাকত, তাহলে তুমি কি করতে? খলিলের মত তুমিও কি পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসরণ করতে? না কি পুরানো কিংবা চলমান আইনকেই যথেষ্ট বলে মনে করতে? না কি বিকল্প কিছু করার চেষ্টা করতে?" ভেটল বিক্রমকে তাদের নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলল না যে: "যদি প্রশ্ন গুলোর উত্তর তোমার জানা থাকে অথচ প্রকাশ করছ না তাহলে তোমার মোটর সাইকেলটি নিতে দেব না, সুতরাং তোমাকে বলতেই হবে।"

ভেটলের প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানে তুমি কি সহজ সরল ছেলে বিক্রমকে সাহায্য করতে পার?

# ক্ষমতার অংশিদারিত্বের বিভিন্ন রূপ

# Forms of power-sharing

ক্ষমতার অংশিদারিত্ব হল কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিপরীত আদর্শ। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মধ্যে এধারণা প্রচলিত ছিল যে, সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। মনে করা হত ক্ষমতা যদি বিভাজিত হয় সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হবে। এর ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে না এবং শাসন ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়ার ফলে এসকল পুরানো ধ্যান-ধারণাগুলো আমূল বদলে গেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাবতীয় ক্ষমতার মূল উৎস হল জনগণ। গণতন্ত্রে জনগণ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিচালিত করে। আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায় এবং তাদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। জনকল্যাণমূলক নীতি প্রণয়নে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত প্রদানের অধিকার থাকে। সুতরাং গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার যতদূর সম্ভব জনগণের মধ্যে বিকেন্দ্রীভূত করা উচিৎ। আধুনিক গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টনের বিভিন্ন রূপরেখা রয়েছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের এমন কিছু রূপ যা আমরা দেখে আসছি এবং দেখব তা এখানে আলোচনা করা হল।

শাসনের লাগাম

ওল্লে জোহানসন -সুইডেন, ক্যাগলে ব্যঙ্গচিত্র ১৫মেঃ ২০০৫

*২০০৫ সালে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হল। ঐ সময় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রাশিয়ায় রাজনৈতিক সফরে ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাঙ্গচিত্রটিতে গণতন্ত্র এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার মধ্যকার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এই ব্যবস্থাটিকে আরো আকর্ষণীয়ভাবে ব্যাখ্যা করার কোনো বিকল্প উদাহরণের কথা কি তুমি ভাবতে পার?*

১) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগের মত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। এধরনের বিভাজনকে ক্ষমতার অনুভূমিক বিভাজন বলা যেতে পারে। কারণ এধরনের বণ্টন ব্যবস্থায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ একই পর্যায়ে অবস্থান করে। এধরনের বিভাজন নিশ্চিত করে যে কোনো বিভাগই একে অপরের উপর অসীম ক্ষমতা প্রয়োগের একচ্ছত্র অধিকারী হতে পারে না, বরং একটি অপরটিকে নিয়ন্ত্রন করে। এরফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। গত বছর আমি অধ্যয়ন করেছি যে গণতন্ত্রে মন্ত্রীপরিষদ কিংবা সরকারি আধিকারীকগণ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ভোগ করলেও সংসদ কিংবা রাজ্য বিধানসভায় তারা দায়বন্ধ। অনুরূপভাবে বিচারকগণ যদিও শাসন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয় তবে তারা শাসন বিভাগকে আইন সভার দ্বারা প্রণীত আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে ক্ষমতার ভারসাম্য বলা হয়।

২) ক্ষমতা বিভিন্ন পর্যায়ের সরকার সমূহের মধ্যেও বিভাজিত হয় যেমন সমগ্র দেশের জন্য থাকে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক পর্যায়ে থাকে বিভিন্ন রাজ্য সরকার। সমগ্র দেশের জন্য এই ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ভারতে সমগ্র দেশের জন্য প্রযোজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলা হয়। আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারগুলো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

ভারতে এদেরকে রাজ্য সরকার বলা হয়। পৃথিবীর সকল দেশে অনুরূপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়

না। এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের মত যে সকল দেশে শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন সরকার থাকে সেখানে সংবিধানের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। একারণেই বেলজিয়াম এবং শ্রীলঙ্কায় ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা পরস্পর থেকে ব্যতিক্রম। এব্যবস্থাকে ক্ষমতার যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাজনও বলা হয়। এই নিয়ম অনুসারে রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলোর নীচুস্তরে স্থানীয় সরকারের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায় যেমন পঞ্চায়েত কিংবা পৌরপ্রতিষ্ঠানে। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক কিংবা স্থানীয় সরকার সমূহের মধ্যে এধরণের ক্ষমতা বণ্টনকে আমরা ক্ষমতার উলম্ব বিভাজন বলেও আখ্যায়িত করতে পারি। পরবর্তী অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত অধ্যয়ন করব।

৩) ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ধর্মীয় কিংবা ভাষাগোষ্ঠী সমূহের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল বেলজিয়ামের ‘কমিউনিটি সরকার’ ব্যবস্থা। কিছু কিছু দেশে সাংবিধানিক ভাবে বা বিশেষ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণি ও মহিলাদের জন্য আইন সভায় কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিগত বছরে আমাদের দেশের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় ‘সংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্র’ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি। এধরনের ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হল সরকার ও প্রশাসনে বিভিন্ন প্রকারের অনগ্রসর সামাজিক গোষ্ঠী সমূহের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে না করে। ক্ষমতা বন্টন ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু ও পিছিয়েপড়া সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাঠ্যক্রমের দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

৪) রাজনৈতিক দল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ কিংবা প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যেও ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লক্ষ্য করা যায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা অর্জনের জন্য নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে নাগরিকরা তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে পারে। সমকালীন গণতান্ত্রিক সমাজে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। এই ধরণের প্রতিযোগিতার ফলে শাসন ক্ষমতা কোনো একটি নির্দিষ্ট দল বা ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হতে পারে না। সময়ে সময়ে শাসন ক্ষমতা বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল কিংবা সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মধ্যে বণ্টিত হয়। যখন দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল জোট গঠন করে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করে তখন ক্ষমতা বণ্টন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। জোট যদি নির্বাচনে জয়ী হয তখন জোট সরকার গঠিত হয় এবং শাসন ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব লাভ করে।গণতন্ত্রে কারখানা শ্রমিক, কৃষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থার মত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীও অপ্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা ভোগ করে। শাসন ক্ষমতায় সংশ্লিষ্ট পরিচালন কমিটি সমূহে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে অথবা সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে এধরনের স্বার্থ কিংবা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমূহ প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে। পাঠক্রমের তৃতীয় ইউনিটে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী ও সামাজিক গোষ্ঠীর আন্দোলন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

এখানে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব সম্পর্কে কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। নীচের কোন্‌টি চার প্রকারের ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থার কোনো একটিকে প্রতিনিধিত্ব করে? কে কার সাথে ক্ষমতা ভোগ করছে?

- বম্বে হাইকোর্ট মহারাষ্ট্র সরকারকে সেখানকার সাতটি শিশু সদনের ২০০০ শিশুর জীবন ধারণের মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেছে।
- কানাডার ওন্টারিয়োর প্রাদেশিক সরকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে রাজি হয়েছে। গ্রামীণ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে প্রাদেশিক সরকার আদিবাসি সম্প্রদায়ের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সহিত কাজ করে যাবে।
- ইউনিয়ন অব রাইট ফোর্সেস এবং লিবারেল ইয়াবলোকো মুভমেন্ট নামে রাশিয়ার দুটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল একটি শক্তিশালী ডানপন্থি জোট গঠনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। পরবর্তী সংসদীয় নির্বাচনে তারা যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম প্রস্তাব করেছে।
- নাইজেরিয়ার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অর্থমন্ত্রীগণ সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেশের সামগ্রিক আয়ের উৎসগুলো প্রকাশ করার জন্য আবেদন করেন। তারা এটাও জানতে চান যে, কোন্ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার সমূহের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করে থাকে।

## অনুশীলনী

১) আধুনিক গণতন্ত্রে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের বিভিন্ন রূপগুলো কী কী ? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও।

২) ভারতের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের একটি করে আইনগত ও নীতিগত কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩) এই অধ্যায়টি পাঠ করে তিনজন বিদ্যার্থী ভিন্ন ভিন্ন উপসংহারে উপনীত হল। এর কোন্‌টির সাথে তুমি সহমত পোষণ কর এবং কেন? ৫০টি শব্দের মধ্যে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

থন্মান— ক্ষমতার অংশীদারিত্ব শুধুমাত্র ঐ সকল সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োজন যেখানে ধর্মীয়, ভাষাগত এবং বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা বিরাজমান।

মাথাই— ক্ষমতার অংশীদারিত্ব শুধুমাত্র ঐসকল বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত যেখানে আঞ্চলিক বিভিন্নতা রয়েছে।

আসেফ— প্রত্যেক সমাজেই কোনো না কোনো প্রকারের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব মূলক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যদিও সেটি আকারে ছোটো অথবা সামাজিক বৈচিত্রতা শূন্য।

৪) বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের নিকটবর্তী মার্চটেম শহরের মেয়র সেখানকার বিদ্যালয়গুলোতে ফরাসি-ভাষা নিষিদ্ধ করণের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই বিধি নিষিদ্ধ ফ্লেমিস শহরটিতে বসবাসকারী ডাচ ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সহায়ক হবে। তুমি কি মনে কর এই ব্যবস্থাটি বেলজিয়ামের চলমান ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ? ৫০টি শব্দের মধ্যে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

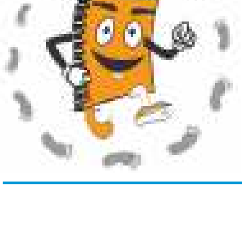

## অনুশীলনী

৫) নীচের রচনাংশটি পড়ো। এখানে প্রদত্ত ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থার যে কোনো একটি আইনগত যুক্তি বা কারণ খুঁজে বের কর।

"সংবিধান প্রণেতাদের আকাঙ্ক্ষা এবং মহাত্মাগান্ধির স্বপ্ন পূরণের জন্য আমাদের উচিত পঞ্চায়েতসমূহকে আরোও বেশি ক্ষমতা প্রদান করা। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা হল আদর্শ গণতন্ত্রের প্রতীক স্বরূপ। এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মূল উৎস স্বরূপ যে জনগণ, তাদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা হস্তান্তর একদিকে যেমন দুর্নীতি হ্রাসে সহায়ক হয় অন্যদিকে এর মাধ্যমে তৃণমূলস্তরে প্রশাসনিক দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। জনগণ যখন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার রূপায়ণে অংশগ্রহণ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা এসকল উন্নয়ন প্রকল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে দুর্নীতির মধ্যস্ততাকারীরা নির্মূল হয়। সুতরাং পঞ্চায়েতিরাজ হল এমন ব্যবস্থা যা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।"

৬) ক্ষমতার অংশীদারিত্বের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানাহ যুক্তি তুলে ধরা হয়। ক্ষমতার অংশীদারিত্ব সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত যুক্তিগুলোর মধ্য থেকে সপক্ষের যুক্তিগুলো চিহ্নিতকর। উত্তর বাছাই করার ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোডগুলো ব্যবহার কর। ক্ষমতার অংশীদারিত্ব :

ক) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান সংঘর্ষ হ্রাস করে।

খ) স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা কমিয়ে আনে।

গ) সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

ঘ) বৈচিত্রতার মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করে।

ঙ) বিভাজন এবং অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

চ) সরকার ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

ছ) দেশের ঐক্য ও সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অ | ক | খ | ঘ | চ |
| আ | ক | গ | ঙ | চ |
| ই | ক | খ | ঘ | ছ |
| ঈ | খ | গ | ঘ | ছ |

৭) বেলজিয়াম এবং শ্রীলঙ্কায় ক্ষমতার অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত বক্তব্যগুলো বিবেচনা কর।

ক) বেলজিয়ামে ডাচ ভাষাভাষী সংখ্যাগুরু জনগণ ফরাসি ভাষাভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে।

খ) শ্রীলঙ্কায় সরকারি নীতি সিংহলি ভাষাভাষী সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর আধিপত্যের সপক্ষে প্রণীত হয়েছে।

গ) শ্রীলঙ্কার তামিল জনগণ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সুরক্ষা এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সমান সুযোগের ব্যবস্থা রাখার জন্য সেখানে ক্ষমতার অংশীদারিত্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু করার জন্য জোড়ালো দাবী পেশ করেন।

ঘ) বেলজিয়ামে এককেন্দ্রিক সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তর দেশটিকে ভাষার ভিত্তিতে সম্ভাব্য বিভাজন থেকে রক্ষা করেছে।

নীচের কোন্ বক্তব্য গুলো সত্য ?

অ) ক, খ, গ এবং ঘ (আ) ক, খ এবং ঘ

ই) গ এবং ঘ (ঈ) খ, গ এবং ঘ

# অনুশীলনী

৮) ১নং তালিকাটিকে (ক্ষমতার অংশীদারিত্বের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কিত) ২নং তালিকার সাথে (সরকারের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কিত) মিলিয়ে দেখ। প্রদত্ত কোডগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর।

| | প্রথম তালিকা | দ্বিতীয় তালিকা |
|---|---|---|
| ১ | সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন | (ক) সম্প্রদায়মূলক সরকার |
| ২ | বিভিন্ন প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন | (খ) ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ |
| ৩ | বিভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন | (গ) জোট সরকার |
| ৪ | দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন | (ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার |

| | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|---|
| অ | ঘ | ক | খ | গ |
| আ | খ | গ | ঘ | ক |
| ই | খ | ঘ | ক | গ |
| ঈ | গ | ঘ | ক | খ |

৯) ক্ষমতার অংশীদারিত্ব সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত দুটি বক্তব্যকে বিবেচনা কর। প্রদত্ত কোডগুলো ব্যবহার করে সঠিক উত্তর নির্ণয় কর।

ক) ক্ষমতার অংশীদারিত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে কল্যাণকর।

খ) এই ব্যবস্থা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠির মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষ হ্রাস করতে সাহায্য করে।

নিচের কোন্ বক্তব্যটি সত্য অথবা মিথ্যা?

| | |
|---|---|
| অ) | ক সত্য কিন্তু খ মিথ্যা |
| আ) | ক এবং খ উভয়ই সত্য |
| ই) | ক এবং খ উভয়ই মিথ্যা |
| ঈ) | ক মিথ্যা কিন্তু খ সত্য। |

# যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federalism)

## সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Overview) ঃ

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যে ক্ষমতার উল্লম্ব বিভাজনের কথা উল্লেখ করেছি। এই ধরনের বিভাজন আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার অংশীদারিত্বের একটি প্রধান রূপ। এই অধ্যায়ে আমরা ক্ষমতার উল্লম্ব বিভাজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই বিভাজনকে সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এর পরবর্তী অধ্যায়টি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তত্ত্ব এবং বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করবে। বাস্তব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে যে সকল সাংবিধানিক ধারাসমূহ সাহায্য করেছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং এর সাথে যুক্ত রাজনীতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে। এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে আমরা স্থানীয় সরকার সম্পর্কেও বলার চেষ্টা করব যা আমাদের ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সরকারের তৃতীয় স্তর হিসাবে চিহ্নিত এবং এটি অত্যন্ত অভিনব।

অধ্যায় ২

# যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কি? (What is federalism?)

ভারত সরকারকে আমি কী নামে ডাকব? এই নিয়ে আমি বিভ্রান্ত। এটা কি এককেন্দ্রিক, নাকি যুক্তরাষ্ট্রীয়?

চলো একটু সময়ের জন্য পূর্বের অধ্যায়ে ফিরে যাই, যেখানে আমরা বেলজিয়াম ও শ্রীলঙ্কার শাসন ব্যবস্থায় একটি বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছি। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে বেলজিয়ামের সংবিধানে যে পরিবর্তনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার সমূহের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান। বহু আগে থেকেই বেলজিয়ামে আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব ছিল। তাদের নিজস্ব ক্ষমতা ও ভূমিকা ছিল। কিন্তু ওই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও সময় প্রত্যাহার করে নিতে পারত। ১৯৯৩ সালে সেখানে একটি মৌলিক পরিবর্তন সংগঠিত হয় যাতে আঞ্চলিক সরকার সমূহের হাতে প্রভূত সাংবিধানিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এই ক্ষমতাগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছিল। সুতরাং বেলজিয়ামের শাসন এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পরিবর্তিত হয়।

শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি ছিল একটু ভিন্ন। সেখানে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারে হাতে যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত। যদিও তামিল নেতাদের দাবি ছিল শ্রীলঙ্কাতেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু হোক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে বণ্টিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণত দুই ধরনের সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রথমটি হল সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, যার হাতে জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর দায়িত্ব থাকে।

দ্বিতীয় প্রকারটি হল আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা, যা সেখানকার প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত। উভয় প্রকারের সরকারই নিজেদের হাতে অর্পিত ক্ষমতা ভোগ করে এবং এখানে কেউ কারোর উপর নির্ভরশীল নয়।

তথ্যসূত্র ঃ মন্ট্রিল এবং কিংস্টন, হ্যান্ডবুক অব ফেডারেল কান্ট্রিসঃ ২০০২, ম্যাকগিল কুইন্স, ইউনিভারসিটি প্রেস, ২০০২।

যদিও বিশ্বের ১৯২টি রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ২৫টি রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান, তবু তাদের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। বেশিরভাগ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বর্তমান। উপযুক্ত মানচিত্রে তুমি কি এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করতে পার?

এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার বিপরীত। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় হয় এক ধরনের সরকার বিদ্যামান থাকে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ইউনিট থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু নির্দেশিকা জারি করতে পারে যা স্থানীয় কিংবা প্রাদেশিক সরকারগুলো পালন করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার একচেটিয়াভাবে প্রাদেশিক সরকারের উপরে অবশ্য পালনীয় কোনো নির্দেশিকা জারি করতে পারে না। রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকার এমন কিছু ক্ষমতা ভোগ করে যার জন্য তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু উভয় প্রকারের সরকারকেই তাদের কাজের জন্য আলাদাভাবে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

চলো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ করি ঃ

১) দুই বা ততোধিক স্তরের সরকার ব্যবস্থা।

২) একই জনগণ বিভিন্ন স্তরের সরকার দ্বারা শাসিত হয়। নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন, কর আরোপ অথবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্তরের সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকে।

৩) ওই সকল ক্ষমতা ও দায়িত্বের ক্ষেত্র সংবিধান দ্বারা সুনির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং প্রত্যেক স্তরের সরকারের অস্তিত্ব ও তাদের অর্জিত ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত।

৪) এই ব্যবস্থায় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক বিষয়গুলোকে এক তরফাভাবে কোনো সরকার পরিবর্তন করতে পারে না। সুতরাং যে কোনো পরিবর্তন উভয় স্তরের সরকারের সম্মতি নিয়ে করতে হয়।

৫) সংবিধানে বর্ণিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আদালত চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কোনো বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের সরকারগুলোর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সেক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

৬) প্রতিটি পর্যায়ের সরকারের আয়ের উৎস সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা থাকে। এর ফলে সরকার সমূহের আর্থিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত থাকে।

৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুই ধরনের উদ্দেশ্য থাকে ঃ দেশের ঐক্য ও সংহতি সুরক্ষিত ও সমুন্নত রাখা, পাশাপাশি আঞ্চলিক বৈচিত্র্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। সুতরাং, দুটি উদ্দেশ্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্ষমতার অংশীদারিত্বের সাথে সম্পর্কিত কিছু আইন কানুনের ক্ষেত্রে সকল প্রকারের সরকারকেই সম্মতি প্রদান করতে হয়। এই ধরনের সম্মতি পত্রের অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ভাজন থাকতে হয়। একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুটি মৌলিক দিক থাকে। একটি হল পারস্পরিক বিশ্বাস অন্যটি হল সহাবস্থানের প্রতি যৌথ সম্মতি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন হয়। ক্ষমতার এই ভারসাম্য কোনো দেশের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর নির্ভর করে যার মাধ্যমে সেই দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সাধারণত দু'ভাবে কোনো দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রথমটি সংগঠিত হয় যখন দুই বা ততোধিক স্বাধীন রাজ্য স্বেচ্ছায় এক সাথে মিলে বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন করে এবং নিজেদের সার্বভৌমত্বকে একত্রীভূত করে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। এরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে জাতীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী ও সমানভাবে শক্তিশালী। এটি হল "সহমত ভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্র" (Coming together federations)।

দ্বিতীয় প্রকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি বৃহৎ দেশ তার ক্ষমতাগুলোকে জাতীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করে। ভারত, স্পেন এরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উদাহরণ। এটি হল "সহাবস্থান ভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্র" (holding together federations) এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের তুলনায় অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারসমূহ অসম ক্ষমতা ভোগ করে। আবার কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রাদেশিক সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যদি শুধুমাত্র বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে বেলজিয়ামের মত ছোটো দেশ এই ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করেছে?

## টীকা

আওতাভুক্ত ক্ষেত্র (Jurisdiction) এটি এমন এলাকা বা ক্ষেত্রকে বোঝায় যার উপর কোনো ব্যক্তির আইনগত অধিকার থাকে, এটি কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা কিংবা কোনো প্রকার বৈষয়িক ক্ষেত্রও হতে পারে।

নতুন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবের উপর নেপালের কিছু নাগরিক নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন তাদের আলোচনার অংশ বিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

**খাগরাজ** ঃ- আমি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পছন্দ করি না। কারণ ভারতের ন্যায় এখানেও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হবে।

**সারিতা** ঃ- আমাদের দেশ খুব বিশাল নয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন নেই।

**বাবুলাল** ঃ- আমি আশাবাদী যে যদি তারা নিজেদের সরকার গঠন করতে পারে তাহলে তরাই অঞ্চল স্বায়ত্ত শাসনে আরও বেশি ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

**রাম গণেশ** ঃ- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই আমার পছন্দ, কারণ এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে রাজা যে ধরনের একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করতেন, তা এখন থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভোগ করবেন।

এই আলোচনায় তুমি যদি অংশগ্রহণ করতে তাহলে উল্লেখিত মন্তব্যগুলোর প্রতি তোমার কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হত? মন্তব্যগুলোর কোন্‌টি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে? কীভাবে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয়?

## কীভাবে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র? (What makes India a Federal Country)

পূর্বের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে ছোটো দেশ হওয়ার পরেও বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে বেলজিয়াম এবং শ্রীলঙ্কা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। বৈচিত্র্যময় অঞ্চল, ধর্ম ও ভাষায় ভরপুর এই বিশাল ভারতবর্ষ সম্পর্কেও বা কী বলা যেতে পারে? আমাদের দেশের ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থার প্রকৃতি কীরূপ?

চলো সংবিধান থেকেই এর আলোচনা শুরু করি। অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং রক্তাক্ত বিভাজনের মধ্য দিয়ে ভারত একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার ক্ষণকাল পরেই দেশীয় রাজ্যগুলো ভারতের সাথে যুক্ত হয়। সংবিধান ঘোষণা করে যে ভারত হল রাজ্যসমূহের সংঘ (Union of States)। যদিও সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র শব্দটি সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি, তবে ভারত অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এটা কি অদ্ভুত নয়? আমাদের সংবিধানে প্রণেতারা কি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতেন না? না কি তারা ইচ্ছে করেই এ বিষয়টি পরিহার করেছিলেন?

চলো পূর্বে উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাতটি বৈশিষ্ট্যের দিকে ফিরে যাই। আমরা দেখতে পাব যে সবগুলো বৈশিষ্ট্যই ভারতীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রথম থেকেই ভারতীয় সংবিধান সরকারের দুটি স্তর সম্পর্কে উল্লেখ করেছে। তার একটি হল কেন্দ্রীয় সরকার এবং অপরটি হল প্রাদেশিক সরকার। পরবর্তীতে পঞ্চায়েত এবং পৌর পরিষদ নামে তৃতীয় একটি সরকারের কথাও সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে। যে কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেই সরকারের বিভিন্ন স্তরগুলোর নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার পৃথক ক্ষেত্র রয়েছে। ভারতের সংবিধান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের মধ্যে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ত্রিমাত্রিক ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা রেখেছে। এক্ষেত্রে সংবিধান তিনটি তালিকার কথা উল্লেখ করেছে।

- **কেন্দ্রীয় তালিকার** ঃ- দেশের সুরক্ষা, বিদেশ নীতি, ব্যাঙ্ক যোগাযোগ এবং অর্থ সংক্রান্ত আইনগুলো এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এই আইনগুলো কেন্দ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্তির কারণ হল যাতে এগুলো সারা দেশেই একই আঙ্গিকে সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য হয়। উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই আইন প্রণয়ন করতে পারে।

- **রাজ্য তালিকা** ঃ- স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি এবং সেচ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আইন এই তালিকার অন্তর্গত। রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ে একমাত্র রাজ্য সরকারই আইন প্রণয়ন করতে পারে।

● **যুগ্ম তালিকা ঃ-** শিক্ষা, বন, বিবাহ, উত্তরাধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির মত বিষয় যেখানে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ের স্বার্থ যুক্ত রয়েছে, সেগুলো যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখিত বিষয়গুলোতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়ে মিলে আইন প্রণয়ন করে। তবে এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে কোনো সংঘাত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাই প্রাধান্য পায়।

যে বিষয়গুলো উল্লিখিত তিনটি তালিকার কোনোটিতেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি সেগুলোর ক্ষেত্রে কী হয়? কম্পিউটার, সফটওয়্যারের মতো যে বিষয়গুলো সংবিধান প্রণয়নের পরে উঠে আসে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও বা কী হবে? আমাদের সংবিধান অনুসারে এই সকল 'অবশিষ্ট' বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সকল যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও রাজ্য সরকারগুলো সমান ক্ষমতা ভোগ করে না। কিছু রাজ্য সরকার বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নিজস্ব সংবিধানও আছে। ভারতীয় সংবিধানের অনেক ধারাই রাজ্য বিধানসভার সম্মতি ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ করা যায় না। বহিঃরাজ্যের কোনো ভারতীয় নাগরিক জম্মু ও কাশ্মীরে কোনো জমি বা বাড়িঘর ক্রয় করতে পারে না। অনুরূপভাবে কিছু কিছু রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধানের বিশেষ বিশেষ ধারা কার্যকর করা হয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু অঞ্চল সামান্য ক্ষমতা ভোগ করে। এগুলো এমন অঞ্চল যা আকারে ছোট এবং স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হতে পারে না, কিংবা এরা অন্য কোনো রাজ্যের সাথে নিজেদের যুক্তও করতে পারে না। যেমন- চন্ডীগড়, লাক্ষাদ্বীপ, অথবা রাজধানী শহর দিল্লি। এসকল ছোটো ছোটো অঞ্চলগুলোকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলা হয়। এরা রাজ্য সরকারের মতো ক্ষমতা ভোগ করে না। বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যেকার ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর মৌলিক বিষয়। এই ধরনের ক্ষমতার অংশীদারিত্বে কোনো প্রকার পরিবর্তন খুব সহজ নয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা একচ্ছত্রভাবে এ ধরনের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন কাঠামোর কোনো অংশ পরিবর্তন করতে হলে কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনের দ্বারা আইন পাশ করতে হয়। কেন্দ্রীয় সংসদের উভয়কক্ষ দ্বারা পাশকৃত আইন পরবর্তীতে দেশের মোট রাজ্যের অর্ধেকের দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়।

দেশের সংবিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থা বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো সংঘাত হলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বা শীর্ষ আদালত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আয়ের উৎস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিজস্ব ক্ষমতার সীমারেখা মেনে কর ধার্য করতে পারে। এর মাধ্যমে উভয় সরকার নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো পালন করে থাকে।

কৃষি এবং বাণিজ্য যদি রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেটে কৃষি এবং বাণিজ্য মন্ত্রীর কী প্রয়োজন?

**চলো বেতার বার্তা শুনি**

চলো অল ইন্ডিয়া রেডিও দ্বারা প্রচারিত একটি জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদ বিবৃতি এক সপ্তাহ পর্যন্ত শুনতে থাকি। সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত খবরগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করি। তালিকাটি নিম্নে উল্লিখিত প্রকারে বিভক্ত করি।

- কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্কিত সংবাদসমূহ।
- তোমার নিজের রাজ্যের অথবা অন্য কোনো রাজ্য সরকারের সাথে সম্পর্কিত সংবাদসমূহ।
- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সাথে যৌথভাবে সম্পর্কিত সংবাদসমূহ।

- রাজস্থানের পোখরান হল সেই জায়গা যেখানে ভারত তার প্রথম পরমাণু পরীক্ষা করেছিল। মনে কর, যদি রাজস্থান সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের পরমাণু নীতির বিরোধিতা করত, তাহলে সেখানে পরমাণু পরীক্ষা করা কি সম্ভবপর হতো?
- মনে কর, সিকিম সরকার সেখানকার বিদ্যালয়গুলোর জন্য নতুন পাঠ্যবই প্রস্তুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নতুন পাঠ্যবই সমূহের বিষয়বস্তু কিংবা ধরন সম্পর্কে সহমত পোষণ করে না। এই অবস্থায় এই পাঠ্য বইগুলো সেখানকার বিদ্যালয়গুলোতে চালু করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নেওয়া সিকিম সরকারের জন্য কি বাধ্যতামূলক?
- মনে কর, নকশালবাদী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং ওড়িশা সরকারের মুখ্যমন্ত্রীগণ ভিন্ন ভিন্ন নীতি অবলম্বন করেছে। এক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি এ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে এমন কোনো নির্দেশিকা জারি করতে পারেন, যা অনুসরণ করা সকল মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই বাধ্যতামূলক?

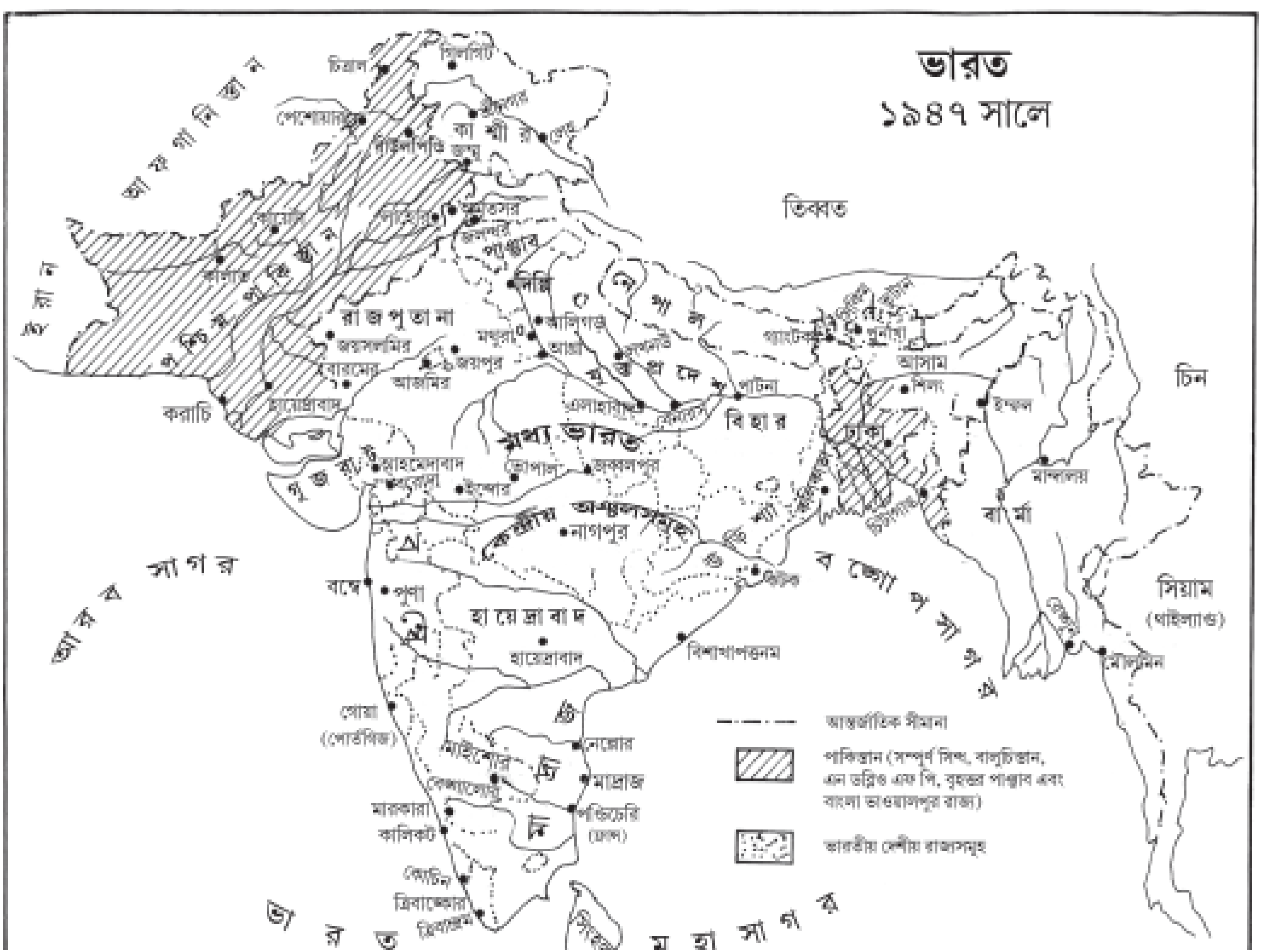

# কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যকর হয়?

## (How is federalism practised?) ঃ-

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করতে হলে প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। যদিও সে সকল নীতিমালা সংবিধানে উল্লেখ থাকাই যথেষ্ট নয়। ভারতে সফলভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে অন্যতম কারণ হল সংবিধানে উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারাসমূহ। তবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সফলতার মূল কারণ হল আমাদের দেশের চলমান গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ। সহমর্মিতার সাথে বেঁচে থাকা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রতিষ্ঠার মতো বিষয়গুলো আমাদের দেশে সার্বজননীনভাবে গ্রহণযোগ্য আদর্শে পরিণত হয়েছে। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে আমাদের দেশে সফলভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ করো।

**ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন** ঃ- আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় দেশে মানচিত্রের দিকে তাকালে তুমি দেখতে পাবে যে ২০১৯ সালের ভারতের মানচিত্রের সঙ্গে তার অনেকটা পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে অনেক নতুন রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে এবং পুরানো রাজ্যের রূপরেখা বিলীন হয়ে গেছে। অনেক রাজ্যের নাম, সীমানা ও আয়তন অনেকটাই বদলে গেছে।

১৯৪৭ সালে ভারতের বেশ কয়েকটি পুরোনো রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করে নতুন রাজ্য গঠন করা হয়েছে। একই ভাষাভাষী লোকেরা যাতে একই অঞ্চলে একই সাথে বসবাস করতে পারে সেটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই নতুন রাজ্য গঠন

## টীকা

- তোমার গ্রাম, শহর কিংবা নগর, স্বাধীনতার সময় থেকে এখনো পর্যন্ত কি একই প্রদেশ বা রাজ্যের অন্তর্গত আছে? যদি না হয় তাহলে তোমার রাজ্যের পুরোনো নাম কী ছিল?
- তুমি কি এমন তিনটি রাজ্যের নাম বলতে পার যেগুলো ১৯৪৭ সালে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু পরে পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম ধারণ করেছে?
- এমন তিনটি রাজ্যকে চিহ্নিত করো যেগুলো বৃহৎ রাজ্য ভেঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছে।

শুধু হিন্দি ভাষা কেন?
তামিল কিংবা বাংলা
ভাষা কেন নয়?

# টীকা

**জোট সরকার ঃ-**
যখন দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল একসাথে মিলিত হয়ে সরকার গঠন করে। সাধারণত জোট সরকারের সদস্য দলসমূহ রাজনৈতিক জোট গঠন করে একটি সমন্বয়ধর্মী ও সর্বজননীন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

করা হয়েছে। আবার কিছু রাজ্য ভাষার ভিত্তিতে সৃষ্টি না হয়ে আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ভিন্ন জাতিসত্ত্বা বা বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল নাগাল্যান্ড, উত্তরাখণ্ড এবং ঝাড়খণ্ড।

যখন ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টি ওঠে অসে তখন অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা নতুন করে দেশ বিভাজনের সম্ভাব্যতার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টি কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রেখেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ আরও বেশি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ হবে। এই ব্যবস্থা দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় আরও সহায়ক হবে।

**ভাষানীতি ঃ-** ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় যে পরীক্ষাটির সম্মুখীন হয়েছিল সেটি ছিল দেশের ভাষানীতি। সংবিধানে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। যদিও হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশের মাত্র ৪০ শতাংশ লোকের মাতৃভাষা হল হিন্দি, সুতরাং অন্যান্য ভাষার সুরক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই হিন্দি ছাড়া আরও ২১টি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সর্বভারতীয় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চাকরি প্রার্থীগণ এগুলোর মধ্য থেকে যে কোনও একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারে। রাজ্যগুলোরও নিজ নিজ সরকারি ভাষা রয়েছে। রাজ্যের বেশিরভাগ সরকারি কাজকর্মই সেই রাজ্যের নিজস্ব সরকারি ভাষায় পরিচালিত হয়।

শ্রীলঙ্কার বিপরীতে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ হিন্দি ভাষা প্রসারের ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। আমাদের সংবিধান অনুসারে সরকারি কাজে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ১৯৬৫ সালে বন্ধ হওয়ার কথা ছিল। তবে অনেক অহিন্দি ভাষী রাজ্য ইংরেজি ভাষাতেই সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করার পক্ষপাতী ছিল। এই দাবিতে তামিলনাড়ুতে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা ক্রমে হিংসাত্মক রূপ ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ইংরেজি ভাষাকেও সরকারি ভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদান করে। অনেক সমালোচক মনে করেন যে, এর ফলে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারকারী অভিজাত শ্রেণিদের বেশি সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। তবে পাশাপাশি হিন্দি ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মে সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার রীতি অপরিবর্তিত থাকে। হিন্দি ভাষার উন্নতির অর্থ এই নয় যে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি ভাষাকে অ-হিন্দিভাষী রাজ্যের মানুষের উপর চাপিয়ে দেবে। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এই ধরনের নমনীয় মনোভাবের কারণে আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতে শ্রীলঙ্কার মতো ভাষাগত সংঘর্ষ সেভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি।

**কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক ঃ-** কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের কাঠামোগত পুনর্গঠন করা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে শক্তিশালী করার অন্যতম মাধ্যম। ক্ষমতা বণ্টনের সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা কীভাবে ফলপ্রসূভাবে কার্যকর হবে তা অনেকটা নির্ভর করে ক্ষমতাসীন দল এবং নেতৃত্ব যেভাবে ওই ব্যবস্থা অনুসরণ করে তার ওপর। ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে একই দল কেন্দ্র ও বেশিরভাগ রাজ্যে শাসন পরিচালনা করেছে। এর অর্থ হল রাজ্য সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশ হিসাবে স্বাধীনভাবে নিজেদের অধিকার ভোগ করতে পারেনি। আবার যখনই কোনো রাজ্যের শাসক দল ভিন্ন হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকার সেইসব রাজ্যের ক্ষমতা দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। ওই সময়কালে সাংবিধানিক ক্ষমতা অপব্যবহার করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিপক্ষ দল দ্বারা পরিচালিত রাজ্য সরকারসমূহকে বরখাস্তও করেছে। এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের বিপরীত। তবে ১৯৯০ এর দশকে এ ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ওই সময়কালে দেশের অনেক রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উত্থান হয়েছে। ওই সময় থেকেই কেন্দ্রে জোট সরকার গঠনের যুগ শুরু হয়। যেহেতু কোনো একটি দল লোকসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারতো না সেহেতু বেশিরভাগ জাতীয় দল আঞ্চলিক দলগুলোর সাথে জোট গঠনের মাধ্যমে কেন্দ্রে সরকার পরিচালনা করত। এই অবস্থাটি ক্ষমতা বণ্টনের নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয় এবং রাজ্য সরকারগুলোর স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

*রাজ্যগুলো আরও বেশি ক্ষমতার দাবি করে।*

© Kutty - *Laughing with Kutty*

*জোট সরকার পরিচালনায় দুর্দশা*

© Ajith Ninan - *India Today Book of Cartoons*

এখানে দুটি ব্যঙ্গাচিত্র রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যেকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছে। রাজ্য কি কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে অগ্রসর হবে? কীভাবে জোট নেতৃত্ব সরকারে অন্তর্ভুক্ত সকল রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করবে?

তুমি কি পরামর্শ দিচ্ছ যে আঞ্চলিকতাবাদ গণতন্ত্রের জন্য কল্যাণকর? তুমি কি ঠিক বলছ?

## ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য

আমাদের দেশে কতগুলো ভাষা আছে? এর উত্তর নির্ভর করে একজন ব্যক্তির নিজস্ব হিসাবের ওপর। ২০০১ সালের জনগণনা প্রতিবেদন থেকে আমরা সাম্প্রতিক তথ্য পেতে পারি। প্রতবেদনটিতে দেশের বিভিন্ন নাগরিকগণ মাতৃভাষা হিসাবে প্রায় ১৫০০ ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অনেকগুলো স্থানীয় ভাষাকে কিছু জনবহুল ভাষার অধীনে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ভোজপুরি, মগধীয়, বুলেন্দখন্ডি, ছত্তিশগড়ি, রাজস্থানি, ভিলি ইত্যাদির মত বিভিন্ন স্থানীয় ভাষাকে 'হিন্দি' ভাষার আওতায় এনে ভাগ করা হয়েছে। এরূপ বিভাজনের পরেও প্রায় ১১৪টি জনবহুল ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্য থেকে ২২টি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলোকে "তপশিলি ভাষা" ও অন্যান্য ভাষাকে 'অ-তপশিলি ভাষা' বলা হয়। ভাষার ক্ষেত্রে ভারত সম্ভবত পৃথিবীর বৈচিত্র্যশালী দেশ।

এখানে যুক্ত করা সারণিটি স্পষ্টভাবে দেখাবে যে, কোনো ভাষাই আমদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের মাতৃভাষা নয়। সবচেয়ে জনবহুল ভাষা হিন্দি হল দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা। হিন্দিকে যারা দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের ৪১ শতাংশ হিন্দিভাষীর সাথে যুক্ত করলেও সে সংখ্যা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করে না। দেশের মাত্র ০.০২ শতাংশ লোকের মাতৃভাষা হলো ইংরেজি। ইংরেজিকে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের সংখ্যাও ১১ শতাংশের বেশি নয়।

সারণিটি যত্ন সহকারে পড়ো। প্রয়োজনে তুমি এটি মুখস্থও করতে পারো। এজন্য তুমি নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করতে পারো।

- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি পাই কিংবা বার চিত্র প্রস্তুত করো।
- ভাষাগত বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে ভারতের একটি মানচিত্র তৈরি করো। বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেদের বসবাসকৃত অঞ্চলগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত করো।
- এমন তিনটি ভাষা অনুসন্ধান করো যা ভারতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রদত্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়নি।

### অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত ভারতের ভাষাসমূহ

| ভাষা | কথা বলা লোকের শতকরা হার (%) |
|---|---|
| অসমিয়া | ১.২৮ |
| বাংলা | ৮.১১ |
| বরো | ০.১৩ |
| ডগরি | ০.২২ |
| গুজরাতি | ৪.৪৮ |
| হিন্দি | ৪১.০৩ |
| কন্নড় | ৩.৬৯ |
| কাশ্মীরি | ০.৫৪ |
| কোঙ্কোনি | ০.২৪ |
| মৈথিলী | ১.১৮ |
| মালয়ালম | ৩.২১ |
| মণিপুরি | ০.১৪ |
| মারাঠি | ৬.৯৯ |
| নেপালি | ০.২৮ |
| ওড়িয়া | ৩.২১ |
| পাঞ্জাবি | ২.৮৩ |
| সংস্কৃত | উল্লেখযোগ্য নয় |
| সাঁওতালি | ০.৬৩ |
| সিন্ধি | ০.২৫ |
| তামিল | ৫.৯১ |
| তেলেগু | ৭.১৯ |
| উর্দু | ৫.০১ |

* ২০০১ সালের প্রতিবেদন অনুসারে প্রত্যেকটি ভাষায় কথা বলা লোকের শতকরা হার দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি জেলার মাও মারাম, পাওমাতা এবং পুরুল মহকুমার জনসংখ্যা দেশের উল্লিখিত মোট জনসংখ্যার সাথে যুক্ত করা হয়নি। কারণ ওই তিনটি মহকুমার জনগণনার প্রতিবেদনটি বিশেষ কারণে বাতিল করা হয়েছে।
উৎস: http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/Statement4.htm

নিম্নোক্ত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহের উদ্ধৃতাংশটুকু পড়ো, যা ২০০৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে টাইমস অব ইন্ডিয়া নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের (SRC) সুপারিশগুলো আজ থেকে প্রায় ৬৪ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। এগুলো ভারতের রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক জীবনকে নতুনভাবে নিজের মতো করে রূপান্তর ঘটিয়েছে ......... । গান্ধিজি এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ তাঁদের অনুসারিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে স্বাধীনতা অর্জনের পর নতুন ভারতবর্ষের ভিত্তি হবে প্রাদেশিক বৈচিত্র্যের সুরক্ষা, যার মধ্যে অন্যতম হল আঞ্চলিক ভাষাগত ঐতিহ্য। তবে ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হল, তখন মূল ভারতের বিভাজনও সংগঠিত হয়ে গেল ...... ।

নির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি ব্যক্তির ঐতিহ্যগত নিষ্ঠার ফলশ্রুতি হল দেশ-বিভাজন। ভাষা কিংবা ঐতিহ্যের প্রতি এরূপ অবিচল আনুগত্য আরও কত বিভাজনের জন্ম দেবে কে জানে? সুতরাং এব্যাপারে নেহেরু, প্যাটেল এবং রাজাজীর দর্শনের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে দুর্বল না করে বরং শক্তিশালী করেছে। এটা পরিপূর্ণভাবে একজন নাগরিককে নতুন পরিচয় প্রদানে সাহায্য করেছে। যেমন কোনো ব্যক্তি কন্নড়, বাঙালি, গুজরাতি কিংবা তামিল হতে পারেন — কিন্তু একই সাথে তিনি ভারতীয়। ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজ্যগুলো মাঝে মাঝে পরস্পরের সহিত বিবাদেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

যদিও এসকল সংঘর্ষ ভালো কিংবা প্রকাশিত নয়, তবে এগুলো আরও ভয়ানক হতে পারত।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল যাতে ভয়ানক সংঘর্ষ এড়ানো যায়। যদি তেলেগু, মারাঠি বা অন্যান্য স্থানীয় ভাষাভাষী লোকেদের আবেগকে মর্যাদা না দেওয়া হত, তাহলে হয়তো আমাদের 'একটি ভাষা থাকত', তবে জাতির সংখ্যা হতে পারত ১৪ কিংবা ১৫।

তোমার কিংবা অন্যান্য রাজ্য যেগুলো ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের দ্বারা প্রভাবিত সেগুলোকে উদাহরণ হিসাবে নাও। লেখক দ্বারা প্রদত্ত উল্লিখিত যুক্তিগুলোর সপক্ষে বা বিপক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

সুতরাং আমাদের অবস্থা প্রায় ত্রিস্তর বিশিষ্ট রেলগাড়ির বগির মত। যেখানে আমি সবসময় নীচের আসন বা শয়ন স্থানটিকে বেশি পছন্দ করি।

## ভারতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ- (Decentralisation in India)

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দুই ধরনের হয়। এর মধ্যে আমরা আমাদের দেশে দুই ধরনের সরকারের কথাই আলোচনা করেছি। কিন্তু ভারতের মত বিশাল দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা এই দুই ধরনের সরকার দ্বারাই যথেষ্ট নয়। ভারতের বেশ কিছু রাজ্য ইউরোপের অনেক স্বাধীন দেশের আয়তনের সমান। জনসংখ্যার দিক থেকে উত্তরপ্রদেশ রাশিয়ার থেকে বড়, মহারাষ্ট্র প্রায় জার্মানির সমান। এই রাজ্যগুলো অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও বিশাল। তাই এখানে ক্ষমতার বিস্তৃত অংশীদারিত্বের প্রয়োজন। ভারতের মতো বিশাল দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সফল করে তুলতে হলে রাজ্য সরকারগুলোর অধীনে একটি অতিরিক্ত স্তরের সরকার থাকা প্রয়োজন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম যুক্তি। এ ধারনার ফলশ্রুতি হল তৃতীয় স্তরের সরকার, যা স্থানীয় সরকার নামে পরিচিত।

ক্ষমতা যখন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলো থেকে নিয়ে স্থানীয় সরকারের হাতে প্রদান করা হয়, তখন তাকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। এই ধরনের বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে মূল যুক্তি হল, এমন অনেক সমস্যা কিংবা বিষয় রয়েছে যেগুলোর সমাধান স্থানীয় স্তরেই হওয়া উচিত। স্থানীয় জনগণই তাদের সাথে যুক্ত সমস্যা ও বিষয়গুলো সম্পর্কে বেশি পরিচিত থাকে। স্থানীয়

ভাবে কোথায় অর্থ ব্যয় করা উচিত এবং বিষয়গুলোকে কীভাবে প্রয়োজনের সাথে মিল রেখে কার্যকর করা যায়, এ সকল ব্যাপারে স্থানীয় জনগণই বেশি অবগত। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মানুষজনই সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। এভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অভ্যাস তৈরি হয় গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার - ব্যবস্থা হল উত্তম পন্থা, যাকে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক সরকার বলা হয়।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তাকে আমাদের সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধান প্রণয়নের সময় থেকেই গ্রামে ও শহরে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সকল রাজ্যেই গ্রামীণ স্তরে পঞ্চায়েত এবং শহর এলাকায় পৌর পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এসকল স্থানীয় সরকারগুলো রাজ্য সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থানীয় সরকারগুলোর নির্বাচন পূর্বে নিয়মিত হত না। আয়ের উৎস নির্ধারণের ক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকারের বিশেষ কোনো ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং সে সময় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা খুব বেশি ফলপ্রসূ হত না।

১৯৯২ সালে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি বিশাল পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের তৃতীয় স্তর হিসাবে পরিচিত স্থানীয় সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যার ফলে স্থানীয় সরকার বর্তমানে অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

- স্থানীয় সরকারগুলোর জন্য নিয়মিত নির্বাচন এখন সাংবিধানিক ভাবে বাধ্যতামূলক।
- স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তপশিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকারের সকল পদেই মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। (ত্রিপুরাতে ৫০ শতাংশ)।
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।
- প্রত্যেক রাজ্যকেই কিছু ক্ষমতা এবং রাজস্ব স্থানীয় সরকারগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দিতে হয়। এই বণ্টন ব্যবস্থা রাজ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা 'পঞ্চায়েত রাজ' নামে বহুলভাবে পরিচিত। প্রত্যেক গ্রাম অথবা কিছু গ্রাম নিয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। এটি এমন একটি স্থানীয় পরিষদ যেখানে বেশ কয়েকজন ওয়ার্ড সদস্য যারা 'পঞ্চ' এবং পরিষদের প্রধান 'সরপঞ্চ' বা গ্রাম প্রধান নামে পরিচিত। এরা সকলেই সেই ওয়ার্ড কিংবা গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত হল গ্রামের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী সংস্থা। পঞ্চায়েত গ্রামসভার তত্ত্বাবধানে কার্য পরিচালনা করে। গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নির্বাচক মণ্ডলীই গ্রাম সভার সদস্য। বছরে দুই কিংবা তিনবার গ্রামসভার অধিবেশন বসে। অধিবেশনে গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক বাজেটের অনুমোদন দেওয়া হয় এবং পঞ্চায়েতের সার্বিক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করা হয়।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রামীণস্তর থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। কতগুলো গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে পঞ্চায়েত সমিতি। ব্লক পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত মণ্ডল গঠিত হয়। এই স্তরের সদস্যগণ ওই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হন। জেলার সকল পঞ্চায়েত সমিতি মিলে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। জেলা পরিষদের বেশিরভাগ সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হন। ওই জেলার আওতাভুক্ত লোকসভার সদস্যগণ, জেলাস্তরের কিছু সরকারি আধিকারিকগণও জেলাপরিষদের সদস্য হন। জেলা পরিষদের চেয়ারপার্সন ওই জেলার রাজনৈতিক প্রধান।

অনুরূপভাবে শহর এলাকাতেও স্থানীয় সরকার বর্তমান। শহরে পৌরসভা গঠিত হয়। তবে বড়ো শহরগুলোতে পৌর নিগম থাকে। পৌরসভা ও পৌর নিগমগুলো নির্বাচিত সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। পৌর প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সনগণ ওই এলাকার রাজনৈতিক প্রধান। পৌর নিগমের প্রধান মেয়র হিসাবে পরিচিত।

প্রধানমন্ত্রী দেশ পরিচালনা করেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য পরিচালনা করেন এই যুক্তিতে জেলা পরিষদের চেয়ারপার্সনকে সেই জেলা পরিচালনা করার কথা। তাহলে জেলা শাসক কিংবা জেলা সমাহর্তা কেন জেলা পরিচালনা করেন?

উল্লিখিত সংবাদপত্রের অংশগুলো ভারতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে কী বলার চেষ্টা করছে?

**ব্রাজিলের একটি অভিজ্ঞতা**

যৌথভাবে অংশ গ্রহণমূলক গণতন্ত্র এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে ব্রাজিলের পর্তো আলেগ্রা শহর একটি অসাধারণ গবেষণা করেছে। শহরটিতে পৌর পরিষদের সমান্তরালে অন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে স্থানীয় জনগণ শহরের উন্নয়নকল্পে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ শহরটির বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিতে পারে। শহরটিকে বিভিন্ন সেক্টর বা ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক সেক্টরে গ্রামসভার মতো অধিবেশন আহ্বান করা হয়, যাতে ওই এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করতে পারে। আবার কিছু সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শহরের সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সভাগুলোতে ওই শহরে বসবাসকারী যে কোনো ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারে। এই সভাগুলোতে বাৎসরিক বাজেটের মূল বিষয়গুলো আলোচিত হয়। সভাগুলোতে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ পৌর সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হয়।

প্রত্যেক বছর গড়ে প্রায় ২০,০০০ নাগরিক এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয়েছে যে বরাদ্দকৃত অর্থ শুধুমাত্র বিত্তশালীদের উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে না। ফলে এখন শহরে পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত বাসগাড়িগুলো দরিদ্র বস্তিবাসী এলাকাতেও যাতায়াত করে। শহর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা শিল্পপতিরা বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কোনো বস্তিবাসীকে তাদের জায়গা থেকে উৎখাত করতে পারবে না।

অনুরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের কেরল রাজ্যের কিছু এলাকাতেও গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষ তাদের নিজ এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছে।

পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে চলমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এই নতুন ধরনের গণতন্ত্রের সর্ববৃহৎ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। বর্তমান ভারতে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত মোট প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ। এই সংখ্যা পৃথিবীর অনেক স্বাধীন দেশের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি। সাংবিধানিক মর্যাদা পাওয়ার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমাদের দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেছে। এই ব্যবস্থা আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও অভিব্যক্তিকে বিস্তৃত করেছে। পাশাপাশি এর কিছু সমস্যাও থেকে গেছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়মিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হলেও গ্রাম সভার বৈঠকগুলো এখনও নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। অনেক রাজ্যই প্রয়োজনীয় ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের কাছে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে হস্তান্তর করেনি। প্রয়োজনের তুলনায় আয়ের উৎস এখনো অপ্রতুল। এ ব্যাপারে অনেক রাজ্য সরকারই উদাসীন। সুতরাং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণে আমাদের এখনও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে।

**এসো অনুসন্ধান করি**

তুমি যে শহরে বা গ্রামে বসবাস কর সেখানকার স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কিছু তথ্য অনুসন্ধান কর।

তুমি যদি গ্রামে বসবাসকারী হও, তাহলে নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামগুলো খুঁজে বের করোঃ তোমার ওয়ার্ডের পঞ্চ অথবা সদস্য তোমার সরপঞ্চ বা গ্রাম প্রধান, তোমার পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের চেয়ারপার্সন। অনুসন্ধান করে দেখো যে তোমার গ্রামে সর্বশেষ গ্রামসভা কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এতে কতজন লোক অংশগ্রহণ করেছিল।

তুমি যদি শহরের অধিবাসী হও, তাহলে তোমার এলাকার পৌর পরিষদের সদস্য এবং পৌর নিগমের চেয়ারপার্সন বা মেয়রের নাম খুঁজে বের করো। পৌর পরিষদ বা পৌর সভার বাজেট এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান পরিকল্পনাগুলো যেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কেও অনুসন্ধান করো।

## অনুশীলনী

১) ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে কালো রঙ-এর নির্দেশক রেখা টেনে নিম্নোক্ত রাজ্যগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করো ঃ- মণিপুর, সিকিম, ছত্তিশগড় এবং গোয়া।

২) পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারত ছাড়া অন্য যে কোনো তিনটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুসরণকারী দেশকে কালো রং এর নির্দেশক রেখা টেনে চিহ্নিত করো।

৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করো যার সাথে বেলজিয়ামের মিল আছে এবং এমন একটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করো যা বেলজিয়ামে অনুসরণ করা বৈশিষ্ট্যের বিপরীত।

৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো কী কী ? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৫) ১৯৯২ সালের সংবিধান সংশোধনের পূর্বে ও পরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে দুটি পার্থক্য নির্ণয় করো।

৬) শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ-

যেহেতু আমেরিকা হল —— ধরনের যুক্তরাষ্ট্র, এর সাথে যুক্ত সকল রাজ্যই সমান ক্ষমতা ভোগ করে এবং এরা —— পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারেরও অংশ। কিন্তু ভারত হল —— ধরনের যুক্তরাষ্ট্র এবং এখানে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কিছু রাজ্যের অধিক ক্ষমতা রয়েছে, ভারতে —— সরকারের ক্ষমতা বেশি।

৭) ভারতে অনুসৃত ভাষানীতি সম্পর্কে নীচে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। এর যে কোনো একটি অবস্থানের সপক্ষে উদাহরণ সহ তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

**সংগীতা ঃ-** এই নীতি আমাদের জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছে।

**আরমান ঃ-** ভাষা ভিত্তিক রাজ্য আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছে এবং প্রত্যেককেই তার ভাষার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল করে তুলেছে।

**হরিশ ঃ-** এই নীতি অন্যান্য ভাষার উপর ইংরেজি ভাষার প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করেছে।

৮) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঃ

ক) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের হাতে কিছু ক্ষমতা প্রদান করে।

খ) আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়।

গ) নির্বাচিত আধিকারিকগণ সরকারের উপর অত্যধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

ঘ) শাসন ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরে সরকারগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয়।

৯) সংবিধানে বর্ণিত ক্ষমতা সংক্রান্ত বিভিন্ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয় এখানে দেওয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণি অনুসারে বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকায় বিভক্ত করো।

ক) প্রতিরক্ষা খ) পুলিশ গ) কৃষি ঘ) শিক্ষা ঙ) ব্যাংক চ) বন

ছ) যোগাযোগ জ) বাণিজ্য ঝ) বিবাহ

| | |
|---|---|
| কেন্দ্রীয় তালিকা | |
| রাজ্য তালিকা | |
| যুগ্ম তালিকা | |

১০) নীচের টেবিলে ভারতের বিভিন্ন সরকারের স্তর এবং তাদের ওপর অর্পিত বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার তালিকার উল্লেখ করা হয়েছে। এই জুটিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো এবং যাচাই করো কোন্ জুটিটির মধ্যে মিল নেই ?

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | রাজ্য সরকার | রাজ্য তালিকা |
| (খ) | কেন্দ্রীয় সরকার | কেন্দ্রীয় তালিকা |
| (গ) | কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার | যুগ্ম তালিকা |
| (ঘ) | স্থানীয় সরকার | অবশিষ্ট ক্ষমতা |

(১১) প্রথম তালিকাটির সাথে দ্বিতীয় তালিকাটি মিলিয়ে দেখো। নিম্নে প্রদত্ত কোডগুলোর সাহায্যে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

| **১ম তালিকা** | | **২য় তালিকা** | |
|---|---|---|---|
| ১) | ভারতীয় ইউনিয়ন | (ক) | প্রধানমন্ত্রী |
| ২) | রাজ্য | (খ) | সরপঞ্চ/গ্রাম প্রধান |
| ৩) | পৌর নিগম | (গ) | রাজ্যপাল |
| ৪) | গ্রাম পঞ্চায়েত | (ঘ) | মেয়র। |

| | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|---|
| (ক) | ঘ | ক | খ | গ |
| (খ) | খ | গ | ঘ | ক |
| (গ) | ক | গ | ঘ | খ |
| (ঘ) | গ | ঘ | ক | খ |

১২) নীচের মন্তব্যগুলো পর্যবেক্ষণ করো।

ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

খ) ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র কারণ এখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে এবং নিজ নিজ বিষয়ের উপরে তারা একচেটিয়াভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

গ) শ্রীলঙ্কাও একটি যুক্তরাষ্ট্র কারণ দেশটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত।

ঘ) ভারত এমন একটি যুক্তরাষ্ট্র নয় কারণ এখানে রাজ্যগুলোর কিছু ক্ষমতা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে বণ্টন করা হয়েছে।

**উল্লিখিত কোন্ মন্তব্যগুলো সঠিক বলে মনে করো ?**

১) ক, খ এবং গ   ২) ক, গ এবং ঘ   ৩) একমাত্র ক এবং খ   ৪) একমাত্র খ এবং গ।

# গণতন্ত্র ও বৈচিত্রতা
# Democracy and Diversity

অধ্যায়-৩

## সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Overview)

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কীভাবে আঞ্চলিক ও ভাষাগত বৈচিত্রতা সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। কিন্তু ভাষা কিংবা আঞ্চলিক পরিচয়ই সাধারণ জনগণকে স্বতন্ত্র করে তুলে না। জাতি, উপজাতি, লিঙ্গা, ধর্ম, শ্রেণি, দৈহিক অবস্থা ইত্যাদি পরিচয় নিয়েও মানুষ অন্যের সাথে নিজেকে পরিচিত ও সম্পর্কিত করে তুলে। এই অধ্যায়ে আমরা গণতন্ত্র কীভাবে সামাজিক বিভাজন, বিভিন্নতা কিংবা বৈষম্যের প্রতি ক্রিয়াশীল সে বিষয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা এমন একটি উদাহরণ দিয়ে শুরু করব যেখানে সামাজিক বৈচিত্রতা নিয়ে জনগণ তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তখন কীভাবে সামাজিক বৈচিত্রতা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে সে বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে জ্ঞাত হব। তারপর কীভাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতি এসকল সামাজিক বৈচিত্রতাকে প্রভাবিত করে অথবা সামাজিক বৈচিত্রতা দ্বারা নিজে প্রভাবিত হয় সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করব।

## মেক্সিকো অলিম্পিকের একটি ঘটনা (A Story from Mexico Olympics)

কার্লোস এবং স্মিথকে আমি কুর্ণিশ জানাই! তারা যা করেছে সে রকম কিছু করার সাহস কি কোনো দিন আমার হবে?

# টীকা

**আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন (১৯৫৪-১৯৬৮) :** ঘটনাবহুল এই সংস্কার আন্দোলন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকান-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রকার আইনগত বর্ণবাদী বৈষম্যের অবসান ঘটানো। এই আন্দোলন জাতিগত বৈষিম্যমূলক আইন ও প্রথার বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের মত অহিংস পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল।

**আফ্রিকান-আমেরিকান :** আফ্রো-আমেরিকান, কৃষ্ণাঙ্গ-আমেরিকান, কৃষ্ণাঙ্গ ইত্যাদি শব্দগুলো অপমান জনকভাবে ঐ সকল আফ্রিকান বংশোদ্ভুত মানুষদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত যাদের পূর্বপুরুষদের ১৭০০ শতক থেকে ১৯০০ শতকের শুরুর সময় পর্যন্ত দাস হিসাবে আমেরিকায় স্থানান্তর করা হয়েছিল।

**কৃষ্ণাঙ্গদের শক্তি :** দ্যা ব্ল্যাক পাওয়ার নামক এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬৬ সালে এবং ১৯৭৫ সালে তার সমাপ্তি ঘটে। এটি ছিল বর্ণবাদ বিরোধী একটি জঙ্গি আন্দোলন। এই আন্দোলনকারিরা আমেরিকায় বর্ণবাদ প্রথা অবসানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে হিংসাত্মক কার্যকলাপকে সমর্থন করত।

এই পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ছবিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে চিত্রায়িত করেছে। এগুলো ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত মেক্সিকো অলিম্পিকের ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় পুরস্কার (মেডেল) বিতরণী একটি অনুষ্ঠানকে উপস্থাপন করেছে। পুরস্কার প্রাপ্ত দুজন আমেরিকান পুরুষ খেলোয়াড় মাথানিচু করে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং ঐ সময় আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হচ্ছে। এই দুইজন আমেরিকান খেলোয়াড়ের নাম টমি স্মিথ এবং জন কার্লোস। তারা আসলে আফ্রিকান বংশোদ্ভুত আমেরিকান। তারা যথাক্রমে স্বর্ণপদক ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। এরা জুতো না পরে শুধু কালো রং-এর মোজা পরিধান করেই পদক গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্য যে তারা দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গা। এধরনের আচরণ অনুসরণের দ্বারা খেলোয়াড়গণ আমেরিকান চলমান বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। কালো দস্তানা পরিধান এবং উত্থিত মুষ্টিবদ্ধ হাত ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষমতার প্রতীক। অনুষ্ঠানের রৌপ্য পদক প্রাপ্ত অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় পিটার নরম্যান তার হাতে মানবাধিকার ব্যাজ পরিধান করার মাধ্যমে দুজন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান খেলোয়াড়ের অনুভূতিকে সমর্থন জানিয়ে ছিল।

তুমি কি মনে কর আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ একটি বিষয়কে সামনে আনার মাধ্যমে কার্লোস এবং স্মিথ উচিত করেছিল? তুমি কি বলবে তারা যা করেছিল সেটি ছিল নিছক রাজনীতি? তোমার মতে কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা আমেরিকান নাহয়েও কেন পিটার নরম্যান ঐ দুজন খেলোয়াড়ের আচরণ সমর্থন করেছিল? নরম্যানের জায়গায় থাকলে তুমি কি করতে?

© wikipedia & photo flickr.com Kevin

২০০৫ সালে সেন্ট জোন্স স্টেট ইউনিভার্সিটিতে টমি স্মিথ এবং জন কার্লোসের প্রতিবাদের স্মারক হিসাবে ২০ ফুট উঁচু একটি ভাস্কর্য স্থাপন করেছিল। উপরে অঙ্কিত চিত্রটি হল ১৯৬৮সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের পদক বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রকৃত ছবি।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা রাজনৈতিক অভিব্যক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে অলিম্পিকের আদর্শ লঙ্ঘনের অভিযোগে স্মিথ এবং কার্লোসকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের পদক কেড়ে নেয়। দেশে ফেরার পর তারা দুজনেই প্রবল সমালোচনার শিকার হয়। নরম্যানও তার কৃতকর্মের অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে এবং পরের অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার দল থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের কর্ম আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হয় এবং আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনকে উৎসাহিত করে। সম্প্রতি সেন জোস (মূল উচ্চারণ 'সান হোজ') স্টেট ইউনিভার্সিটি, যেখানে তারা পূর্বে পড়াশোনা করত, ক্যাম্পাসে তাদের মূর্তি স্থাপন করে। ২০০৬ সালে নরম্যান মৃত্যু বরণ করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় স্মিথ এবং কার্লোস নরম্যানের কফিন বহন করে।

## চলো বিতর্ক করি

কিছু কিছু দলিত সম্প্রদায় ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্ণবাদ বিরোধী সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের দাবি ছিল সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে যেন জাতিবাদ বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদের এধরনের পদক্ষেপের প্রেক্ষাপটে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যা এখানে উল্লেখ করা হল :

***অমরদ্বীপ কউর (একজন সরকারি আধিকারিক) :*** সংবিধান জাতিগত বৈষম্যকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এই ধরনের কিছু বৈষম্যমূলক আচরণ যদি এখনো চলমান তা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়। আমি এ ধরনের কোনো বিষয় আন্তর্জাতিক মঞ্চে উত্থাপনের বিরোধী।

***ওয়নাম (একজন সমাজতত্ত্ববিদ) :*** আমি এধরনের পদক্ষেপের বিরোধী। কারণ জাতিবাদ এবং বর্ণবাদ এক জিনিস নয়। জাতিবাদ হল একধরনের সামাজিক বিভাজন। অন্যদিকে বর্ণবাদ হল জৈবিক বিভাজন। জাতিবাদ বিষয়টিকে এ সম্মেলনে উত্থাপনের অর্থ হল জাতিবাদ ও বর্ণবাদ বিষয়টিকে সমার্থবোধক মনে করা।

***অশোক (একজন দলিত কর্মী) :*** বিষয়টিকে আভ্যন্তরীণ বলে মনে করার যুক্তি প্রদর্শনের অর্থ হল বৈষম্য ও নিপীড়নের উপর উন্মুক্ত আলোচনায় বাঁধা দেওয়া। বর্ণবাদ সম্পূর্ণভাবে জৈবিক নয়। এটি জাতিবাদের মতই আইনি ও সামাজিক বিষয়। জাতিগত বৈষম্যের বিষয়টি অবশ্যই এ সম্মেলনে উত্থাপন করা উচিত।

উল্লেখিত তিনটি মতামতের কোনটির সাথে তুমি অধিক সহমত পোষণ কর এবং কেন?

আমি পাকিস্তানের একদল মেয়ের সাথে সাক্ষাত করেছি। আমি অনুভব করেছি তাদের সাথে আমাদের এমন অনেকগুলো বিষয়ে মিল আছে, যা আমাদের নিজ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েদের সাথে নেই। এধরনের অনুভূতি কি দেশদ্রোহিতার সামিল?

## বিভিন্নতা, সাদৃশ্যতা, বিভাজন (Differences, Similarities, divisions)

উপরে উল্লেখিত খেলোয়াড়দের উদাহরণ ছিল সামাজিক বিভাজন ও বৈষম্যের প্রতি তাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা কি শুধু ঐসকল সমাজেই ঘটে যেখানে বর্ণবাদী বিভাজন বর্তমান? পূর্বের দুটি অধ্যায়ে ইতিমধ্যেই সামাজিক বিভাজনের অন্যান্য রূপ সম্পর্কে তুলে ধরেছে। বেলজিয়াম এবং শ্রীলঙ্কার উদাহরণ আঞ্চলিক ও সামাজিক উভয় বিভাজনের কথাই ব্যক্ত করে। বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করেছি যে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে আমরা ভাষার পাশাপাশি ধর্মীয় বিভিন্নতার কথাও বলেছি। সুতরাং বিভিন্ন সমাজের সামাজিক বৈচিত্রতা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রূপ গ্রহণ করে।

## সামাজিক বিভিন্নতার উৎস (Origins of Social differences)

এধরনের সামাজিক বিভিন্নতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জন্মের মত দৈব ঘটনার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। সাধারণত একটি সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পেছনে আমাদের কোনো হাত থাকে না। আমরা এর অন্তর্ভুক্ত কারণ এ সম্প্রদায়ে আমরা জন্ম গ্রহণ করেছি। জন্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠা এ ধরনের সামাজিক ভিন্নতা আমরা প্রতিদিনকার জীবনে অনুভব করি। আমাদের চারপাশের মানুষগুলোর মধ্যে সবাই নারী কিংবা পুরুষ, তাদের কেউ লম্বা কেউ খাটো, তাদের দৈহিক অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন অথবা তাদের দৈহিক ক্ষমতা কিংবা অক্ষমতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু সকল প্রকার বিভিন্নতাই জন্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠে না। এরমধ্যে কিছু কিছু বিভিন্নতার পেছনে আমাদের নিজেদের হাত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কিছু মানুষ আছে যারা নাস্তিক। তারা কোনো ধর্ম কিংবা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। আবার কিছু মানুষ এমন একটি ধর্মে বিশ্বাস করে, যে ধর্মে তারা জন্ম গ্রহণ করেনি। আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করব, কোন পেশায় নিযুক্ত হব, কোন খেলা খেলব তথা কোন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হব ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি। এধরনের সামাজিক দল বা সম্প্রদায় সৃষ্টির পেছনে আমাদের হাত থাকে। প্রত্যেক প্রকারের সামাজিক ভিন্নতা সামাজিক বিভাজনে পরিণত হয় না। সামাজিক বিভিন্নতা একই সমসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণকে একে অপর থেকে স্বতন্ত্র করে তুলে। কিন্তু তারা আবার বিভিন্ন জনগণের মধ্যে ঐক্য ও স্থাপন করে। বিভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জনগণ নিজেদের সীমানার বাইরেও অনেক সাদৃশ্যতা ও বৈশাদৃশ্যের অংশীদার হয়। উদাহরণস্বরূপ কার্লোস এবং স্মিথ দুজনেই একটি ক্ষেত্রে এক (দুজনই আফ্রিকান-আমেরিকান) অথচ তারা শ্বেতাঙ্গ নরম্যান থেকে ভিন্ন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তারা সবাই এক, যেমন তারা সকলেই খেলোয়াড় এবং তারা সমবেতভাবে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণত এটাও দেখা যায় যে একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মানুষ অনুভব করে যে তারা একই সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। কারণ তাদের গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী স্বতন্ত্র। আবার এটাও সম্ভব যে বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মানুষজন একই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং এরা একে অপরের কাছে থাকা পছন্দ করে। একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ধনী এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকেনা এবং তারা মনে করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একে অপর থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং আমাদের সকলেরই একের অধিক পরিচিতি থাকে এবং সবাই একের অধিক সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের পরিচয়ও ভিন্ন হয়।

© Ares - Cagle Cartoons Inc.

*এই ব্যঙ্গ চিত্রটি বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করতে পারে। তোমার মতে এই ব্যঙ্গ চিত্রটির ব্যাখ্যা কি? তোমার শ্রেণি কক্ষের অন্যান্য বিদ্যার্থীরা এই চিত্রটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে?*

## বৈচিত্র্যতার মাঝে সামঞ্জস্যতা ও বিবাদ (Overlapping and Cross-Cutting differences)

সামাজিক বিভাজন তখনই তৈরি হয় যখন সামাজিক ভিন্নতা একে অপরকে অতিক্রম বা অধিক্রমণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেকার সামাজিক ভিন্নতা সামাজিক বিভাজনে পরিণত হয়েছে । এজন্য যে কৃষ্ণাঙ্গরা সাধারণত গরিব, গৃহহীন এবং বৈষম্যের শিকার। আমাদের দেশের দলিত সম্প্রদায়ও গরিব এবং ভূমিহীন। তারা প্রায়ই বৈষম্য এবং অন্যায়ের সম্মুখীন হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সামাজিক বিভাজন তৈরি হয়, যখন এক প্রকারের সামাজিক ভিন্নতা অন্যদের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় এই অবস্থায় মানুষ মনে করে তারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

যদি একই ধরনের সামাজিক বিভিন্নতা কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে একগোষ্ঠীর জনগণকে অন্যদের বিপরীতে চিহ্নিত করা অনেক কঠিন। অর্থাৎ একটি বিষয়ের উপর বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ যদি একই হয় তাহলে ভিন্ন বিষয়ে তাদের অবস্থানও ভিন্ন হয়। এক্ষেত্রে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড এবং নেদারল্যাণ্ডের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। দুটি দেশ খ্রিস্টান প্রধান হলেও এরা ক্যাথোলিক ও প্রোটেস্টান্ট শ্রেণিতে বিভক্ত। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে শ্রেণি এবং ধর্ম একে অপরকে অধিক্রমণ করে। তুমি যদি ক্যাথোলিক হও তার অর্থ হল তুমি দরিদ্র এবং ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যের শিকার। নেদারল্যাণ্ডে শ্রেণি এবং ধর্মের মধ্যে প্রায় একই ধরনের সামঞ্জস্যতাপূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে। এখানে ক্যাথোলিক এবং প্রোটেস্টান্ট উভয়ের মধ্যেই ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এরফলে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথোলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে বিবাদমান পরিস্থিতি বিরাজ করলেও নেদারল্যাণ্ডে সেই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় না। অধিক্রমণকারী বিভিন্নতার কারণে গভীর সামাজিক বিভাজন ও আশঙ্কা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক বিভিন্নতাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অনেক বেশি সহজ হয়।

পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই কোনো না কোনো প্রকারের সামাজিক বিভাজন বিদ্যমান। দেশটি আকারে ছোট কিংবা বড় এটা কোনো ব্যাপার নয়। ভারত একটি বিশাল দেশ যেখানে বিভিন্ন প্রকারের সম্প্রদায় বসবাস করে। বেলজিয়াম একটি ছোট দেশ কিন্তু সেখানেও অনেক সম্প্রদায়ের বসবাস। জার্মানি এবং সুইডেনের মত দেশ যারা এক সময় ছিল সমশ্রেণিভুক্ত জনগণের দেশ। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের ফলে সেখানেও দ্রুত পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রথার চর্চার মাধ্যমে সেখানে নতুন সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এভাবে পৃথিবীর বহুদেশ বহু-সংস্কৃতির দেশে পরিণত হচ্ছে।

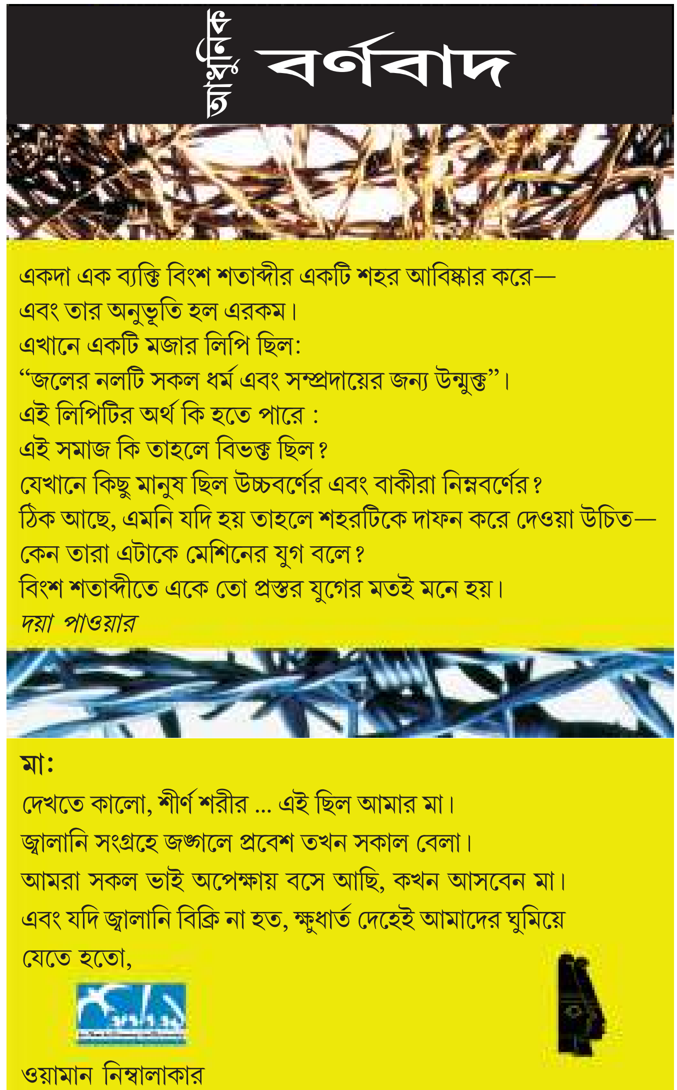


*দলিত কবিদের লেখা উল্লেখিত দুটি কবিতা পড়। তোমার কেন মনে হয় অঙ্কিত পোস্টারের নামকরণ ছিল "অদৃশ্য বর্ণবাদ"।*

### টীকা

**সমশ্রেণিভুক্ত সমাজ :** এটি এমন একটি সমাজ যেখানে সমগোত্রীয় লোকেরা বসবাস করে, যাদের মধ্যে কোনো প্রকার উল্লেখযোগ্য জাতিগত ভিন্নতা থাকে না।

**অভিবাসী :** যে ব্যক্তি একই দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। অথবা একটি দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়। সাধারণত এধরনের স্থানান্তর কর্মসংস্থান কিংবা অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার সন্ধানে ঘটে।

ইমরানা দশম শ্রেণির খ শাখার একজন ছাত্রী। সে এবং তার শ্রেণির সকল বন্ধুরা মিলে নবম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য করার পরিকল্পনা করে যারা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গতমাসে সে তার দলের সদস্য হয়ে দশম শ্রেণির ক শাখার একটি দলের বিরুদ্ধে খো-খো খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। বাড়ি যাওয়ার সময় অন্যান্য শ্রেণির বন্ধুদের সাথে সে একটি বাসে উঠে। তারা সকলেই দিল্লির যমুনা এলাকায় বসবাস করে। ঘরে এসে সে তার বড় বোন নাইমার সাথে মিলে তার ভাই সম্পর্কে অভিযোগ করে যে বাড়িতে কোনো কাজকর্ম করে না। অথচ বোনেরা সবাই মাকে সাহায্য করে। তার বাবা বড় মেয়ের জন্য এমন একজন ভাল পাত্রের সন্ধানে আছে যে হবে সমশ্রেণির মুসলিম এবং অনুরূপ অর্থনৈতিক মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের।

*তুমি কি এখানে ইমরানার বিভিন্ন পরিচয়ের একটি তালিকা তৈরি করতে পার?*

| | | |
|---|---|---|
| পরিবারে | সে একজন | মেয়ে |
| ধর্মক্ষেত্রে | সে একজন | ......... |
| বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে | সে একজন | ......... |
| .......... | সে একজন | .......... |
| .......... | সে একজন | .......... |

## রাজনীতি ও সামাজিক বিভাজন (Politics of Social divisions) :

এসকল সামাজিক বিভাজন কীভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করে? রাজনীতিই বা এসকল সামাজিক বিভাজনে কী ভূমিকা রাখে? প্রথমত, এসকল সামাজিক বিভাজনের সাথে রাজনীতি যুক্ত হলে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিস্ফোরক হয়। গণতন্ত্র বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে। এই প্রতিযোগিতা যে কোনো সমাজকেই বিভাজিত করে। এ প্রতিযোগিতা যখন বিদ্যমান সামাজিক বিভাজনের ক্ষেত্রে সংগঠিত হয় তাহলে তা রাজনৈতিক বিভাজনে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতি সমাজকে বিবাদ, সংঘর্ষ এমনকি দেশকে চরম অনৈক্যের দিকে ঠেলে দেয়। অনেক দেশেই এধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

**পরিণতির ব্যাপ্তি :** উপরে উল্লেখিত উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ঘটনাটি মনে কর। যুক্তরাজ্যের এই অঞ্চলটি বহুবছর ধরেই সংঘর্ষ এবং তিক্ত রাজনৈতিক বিবাদের সাক্ষী। এই এলাকার জনগণ খ্রিস্টান ধর্মের দুটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এর ৫৩ শতাংশ জনগণ প্রোটেস্টান্ট এবং বাকী ৪৪ শতাংশ জনগণ হল রোমান ক্যাথোলিক। ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী জাতিয়তাবাদী দলগুলোর দাবী হল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে ক্যাথোলিক প্রধান দেশ আয়ারল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্রের সাথে যুক্ত করা। অন্যদিকে প্রোটেস্টান্টদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নবাদী দলগুলোর দাবী হল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে প্রোটেস্টান্ট প্রধান যুক্তরাজ্যের সাথে সংযুক্ত থাকা। ইউনিয়নবাদী এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের কারণে শত শত সাধারণ নাগরিক, উগ্রবাদী এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা নিহত হয়। ১৯৯৮ সালে প্রথম বারের মত যুক্তরাজ্য সরকার এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলোর মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাতীয়তাবাদী দলগুলো সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করে।

# বুলগেরিয়া, রোমানিয়া না কি ভারত?

ভ্রমণ থেকে বাড়িতে ফিরে গণেশ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী রোমানিয়ার জনগণ সম্পর্কে মহাশ্বেতা-র সাথে গল্প শুরু করে। গণেশ ইয়ার ডঙ্কা নামক বুলগেরিয়ায় কর্মরত একজন নার্সের সাথে সাক্ষাত করে। রোমানিয়ার জনগণ সম্পর্কে তার বিবরণ এখানে দেওয়া হল :

"একজন নার্স হয়ে কিছু মানুষকে সেবা করার বিষয়টি তুমি অস্বীকার করতে পারনা, কিন্তু রোমানিয়ার লোকজন এক্ষেত্রে খুব নোংরা। যখনি তাদের পরিবারের কেউ সামান্য অসুস্থ হয় তখন তাদের গোটা পরিবার এমনকি প্রতিবেশিরাও হাসপাতালে ছুটে আসে। হাসপাতালে একবার আসার পর তারা কখনো নীরব থাকেনা। চিৎকার, চেঁচামেচি, ধূমপান, যত্রতত্র সিগারেটের অবশিষ্টাংশ নিক্ষেপ এবং দেওয়ালে থুথুফেলা তাদের অভ্যাস। তারা অসহনশীল এবং যখন তখন আমাদের চিকিৎসকদের যন্ত্রণা দিতে থাকে! কোনো কারণে একটু অপেক্ষা করতে হলে তারা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। আসলে এই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো দেখতে আমাদের মত নয়। বর্ণের কারণে তারা অদ্ভুত আচরণ করে, তাদের পোশাক দেখ, তারা দেশের অন্যান্য মানুষদের মত হওয়ার চেষ্টা কেন করে না? আমরা সবাই জানি যে এরা চোর। আমরা এটাও শুনেছি যে রোমানিয়ার এই লোকগুলো নিজেদের রক্ত বিক্রি করে জীবনযাপন করে। তাদের কারোরই হাসপাতালের খরচ মেটাবার সামর্থ নেই। কিন্তু যখনি তারা অসুস্থ হয় তখন অনতিবিলম্বে হাসপাতালে ছুটে আসে এবং ভাল বুলগেরিয়ান নাগরিকদের প্রদত্ত কর-এর বিনিময়ে পরিষেবা গ্রহণ করে।

মহাশ্বেতা বলল, "এটা পরিচিত ঘটনা।"

গণেশ এবার মদরুজেনি সম্পর্কে বলতে শুরু করে, যিনি রোমানিয়ায় বসবাসকারী একজন রুমানিয় নাগরিক। ১৮ বছর বয়সে মদরুজেনি তার প্রথম সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য হাসপাতালে যায়। ডাক্তার কিংবা নার্সকে দেওয়ার মত কোনো টাকা পয়সা তার কাছে ছিলনা। হাসপাতালে যাওয়ার পর কেউ তার চিকিৎসার জন্য মাথা ঘামাল না। পরিশেষে একজন রোমেনিয় সাফাই কর্মী তাকে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিতে সাহায্য করে। এই অবস্থায় একজন নার্স এসে বলল, "এখানে আমরা আরেকজন অপরাধীর খোঁজ পেলাম।" হাসপাতালে রোমেনিয় নাগরিকদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সে বলে: "ডাক্তারগণ সবসময় তাদের চেম্বারের বাইরে আমাদেরকে অপেক্ষমান রেখে দেয়। একদিন এক ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করার আগে স্নান করে নিতে বলে। অবশ্য আমার গায়ে তখন দুর্গন্ধ ছিল। আসলে মাতৃকালীন সময়ে আমি ময়লার ঝুড়ি থেকে খাবার খেতাম। কারণ আমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। আমার স্বামী আমাকে অনেক আগেই পরিত্যাগ করে। আমি ইতিমধ্যেই দুই সন্তানের মা। আমি তখন তৃতীয় বারের মত গর্ভবতী।

সমাজকর্মী আমাকে খাবার দেওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। নতুন শিশু জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবেশিরা আমাকে সাহায্য করল। আমার মাঝে মাঝে মনে হত হাসপাতালে না যাওয়াই ভালো।'

তার এ সমস্ত বর্ণনা শুনে মহাশ্বেতা বলল, "গণেশ, এসব পরিস্থিতি জানতে কেন তোমাকে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরতে হল? এটা শুধু রোমানিয়া, বুলগেরিয়া অথবা রোমান নাগরিকদের গল্প নয়। আমাদের দেশেও এসব ঘটনা বর্তমান। আমাদের সমাজ পদ্ধতিও আমাদেরই জনগণকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করে।"

* তুমি কি মনে কর মহাশ্বেতার বক্তব্য সঠিক? তোমাদের অঞ্চলে কি এমন কোনো সম্প্রদায় আছে যাদের প্রতি রোমা নাগরিকদের মতই আচরণ করা হয়?

* তুমি কি এমন মানুষদের কথা জান যারা ইয়ারডঙ্কা কিংবা মদরুজেনির সুরে কথা বলে? যদি হ্যাঁ হয় তাহলে চিন্তা কর বিপরীত দিক থেকেও যদি তুমি এটা শুন তাহলে ঘটনা কি দাঁড়াবে? তুমি কি মনে কর বুলগেরিয়া সরকারকে এটা নিশ্চিত করা উচিত যে রোমা নাগরিকগণ যেন বুলগেরিয়ানদের মতই আচরণ করে ও পোশাক পরিধান করে?

পৃথিবীর সবখানে, এমন কি ইউরোপেও এটা ঘটে। আমি ভাবতাম শুধু ভারতের মত দেশগুলোতেই সামাজিক বিভাজন বিদ্যমান।

যুগোস্লাভিয়ায় অনুরূপ ঘটনার শেষ পরিণতি সুখকর হয়নি। ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষের ভিত্তিতে গড়ে উঠা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা যুগোস্লাভিয়াকে ভেঙ্গে ছয়টি স্বাধীন দেশে পরিণত করে।

এধরনের উদাহরণ কিছু ব্যক্তিকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনকে কখনো একসাথে মিশতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের মতে এটাই সবচেয়ে সুন্দর যদি কোনো দেশেই সামাজিক বিভাজন না থাকে। তবে যদি কোনো দেশে সামাজিক বিভাজন থাকে তাহলে কোনো ভাবেই এর রাজনৈতিক বহি:প্রকাশ হওয়া উচিত নয়।

একি সাথে এটাও ঠিক যে সকল সামাজিক বিভাজনের রাজনৈতিক বহি:প্রকাশ এধরনের ভয়াবহ রূপ ধারন করে না। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ করেছি যে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই কোনো না কোনো ধরনের সামাজিক বিভাজন বিরাজমান। যেখানেই এই বিভাজন আছে সেখানে এর রাজনৈতিক বহি:প্রকাশও ঘটে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা খুব স্বাভাবিক যে রাজনৈতিক দলগুলো এসকল বিভাজন নিয়ে রাজনীতি করে, যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, নানাহ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সচেষ্ট থাকে এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অভিযোগশুনে তার সমাধানের নিমিত্তে নীতি প্রণয়ন করে। সামাজিক বিভাজন যে কোনো দেশের ভোটদানকে প্রভাবিত করে। একটি সম্প্রদায়ের লোকজন কিছু রাজনৈতিক দলকে অন্যান্য দলের তুলনায় অগ্রাধিকার প্রদান করে। কোনো কোনো দেশের রাজনৈতিক দল সে দেশের একটি মাত্র সম্প্রদায়কে নিয়ে মাতামাতি করে। তবে এসব পরিস্থিতি সাধারণত কোনো দেশকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে না।

*প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের উপনিবেশ হিসাবে পরিচিত উত্তর আয়ারল্যান্ডের কিছু সমাজকে দেওয়াল দ্বারা বিভাজিত করা হয়। এই দেওয়ালগুলোতে প্রায়ই কিছু লেখনি দেখতে পাওয়া যায়। ২০০5 সালে ব্রিটিশ সরকার এবং আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখিত দেওয়াল লেখনিগুলো কি ধরনের সামাজিক সংঘর্ষের পরিচয় বহন করে?*

© Orion / Juska Rantanen flickr.com

**তিনপ্রকার নির্ধারক (Three determinants)** সামাজিক বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা রাজনৈতিক পরিণতির নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। সর্বপ্রথম, এর পরিণতি নির্ভর করে কীভাবে জনগণ নিজেদের পরিচয় দিতে অভ্যস্ত তার উপর। যদি জনগণ মনে করে যে তাদের পরিচয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অপরিবর্তনীয় তাহলে তাদেরকে অন্যের সাথে সমন্বয় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত উত্তর আয়ারল্যান্ডের জনগণ মনে করত যে তারা শুধুই ক্যাথোলিক অথবা প্রোটেস্টান্ট ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিরাজমান বৈচিত্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ছিল কঠিন কাজ। সমন্বয়ের কাজটি তখনই সহজ হয় যখন জনগণ নানাবিধ পরিচয় বহন করে এবং একটি জাতীয় পরিচয় দ্বারা একে অপরের পরিপূরক বলে মনে করে। যেমন বর্তমান বেলজিয়ামের বেশিরভাগ নাগরিক মনে করে যে তারা যতটুকু বেলজিয়ান ততটুকুই তার ডাচ কিংবা জার্মান ভাষী। এই মনোভাব তাদেরকে সহনশীলতার সাথে বসবাস করতে সাহায্য করছে। আমাদের দেশেও বেশিরভাগ মানুষ এই ধরনের পরিচয় দিতে পছন্দ করে। যেমন তারা মনে করে যে যতটুকু তারা একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করে, একটি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, একটি সংস্কৃতি অনুসরণ করে কিংবা একটি রাজ্যে বসবাস করে, ঠিক ততটুকুই বিশ্বাস করে যে তারা সবাই মিলে ভারতীয়।

দ্বিতীয়ত, এটা নির্ভর করে কীভাবে রাজনৈতিক নেতারা কোনো একটি সম্প্রদায়ের দাবিগুলো উত্থাপন করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবি কিংবা প্রত্যাশাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের

কাজটি সহজতর হয় যদি সেগুলো সাংবিধানিক রূপরেখার মধ্যে সমাধানযোগ্য হয় এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার বিনিময়ে না হয়। শ্রীলঙ্কায় "শুধুমাত্র সিংহলিদের জন্য" দাবিগুলো তামিল সম্প্রদায়ের পরিচয় সত্ত্বা ও স্বার্থের বিনিময়ে পূরণ করা হয়েছিল। যুগোস্লাভিয়ায়, বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়ের নেতারা নিজেদের দাবিগুলো এমন ভাবে উত্থাপন করেছিল যা একই দেশের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব ছিলনা।

তৃতীয়ত, এটা নির্ভর করে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবিগুলোর প্রতি সরকার তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। শ্রীলঙ্কা এবং বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি যে যদি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা বণ্টনে আগ্রহী হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলো বিবেচনার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হয় তাহলে সামাজিক বিভাজন রাষ্ট্রের প্রতি হুমকি হিসাবে খুব বেশি একটা প্রতিয়মান হয় না। কিন্তু যদি তারা জাতীয় অখণ্ডতার নামে জনগণের প্রত্যাশাগুলো দমন করার চেস্টা করে তাহলে সেক্ষেত্রে শেষ পরিণতি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। এধরনের আরোপিত অখণ্ডতার প্রচেস্টা দেশ বিভাজনের বীজ বপন করে।

সুতরাং কোনো একটি দেশের সামাজিক বিভিন্নতার বহি:প্রকাশকে বিপদের উৎস হিসাবে দেখা ঠিক নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক বিভাজন খুবই স্বাভাবিক এবং কখনো কখনো তা উপকারী। কারণ এই অবস্থা বিভিন্ন সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের দুর্দশার প্রতি সরকারি দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়ক হয়। রাজনীতিতে বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক বিভাজনের বহি:প্রকাশ কখনো কখনো একটিকে আরেকটি দ্বারা পূরণ কিংবা প্রতিহত করার মাধ্যমে এর বিপুলতাকে সংকোচিত করে। ফলে

গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

কিন্তু বৈচিত্রতার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং সেগুলোকে সমন্বয় করার ক্ষেত্রে আগ্রহ খুব সহজে গড়ে উঠে না। যে সকল মানুষ মনে করে যে তারা প্রান্তিক, বঞ্চিত এবং বৈষম্যের শিকার, তাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। এধরনের সংগ্রাম গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রায়ই সংগঠিত হয়, সাংবিধানিক সীমারেখা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের দাবিগুলোকে উত্থাপন করতে হয়। পাশাপাশি নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের জন্য সঠিক জায়গা করে নিতে হয়। কখনো কখনো সামাজিক বিভিন্নতা সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্যের কারণে অগ্রহণযোগ্য রূপ ধারণ করে। এধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা আন্দোলন কখনো কখনো সহিংসতার পথ অবলম্বন করে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রতি বিদ্রোহী করে তুলে। যাইহোক, ইতিহাস প্রমাণ করে যে গণতন্ত্রই হল উৎকৃষ্ট পথ যার মাধ্যমে স্বীকৃতি অর্জন এবং বৈচিত্রতার সার্বিক সমন্বয় সম্ভব।

জীবনের বিভিন্ন দিকের সামাজিক বিভাজনের কিছু ছবি আঁক বা সংগ্রহ কর। খেলাধূলার জগতে এমন কিছু সামাজিক বিভাজন অথবা বৈষম্যের উদাহরণ সম্পর্কে তুমি কি ভাবতে পার?

সুতরাং তুমি বলছ যে একটি একক এবং বিশাল বিভাজনের তুলনায় অনেকগুলো ছোট ছোট বিভাজন ভালো? তুমি কি এটাও বলছ যে রাজনীতি হল অখণ্ডতার একটি শক্তি?

## অনুশীলনী

১) এমন তিনটি কারণ সম্পর্কে আলোচনা কর যা সামাজিক বিভাজনজনিত রাজনীতির ফলাফলকে নির্ধারণ করে।

২) কখন একটি সামাজিক ভিন্নতা সামাজিক বিভাজনে পরিণত হয়?

৩) কিভাবে সামাজিক বিভাজন রাজনীতিকে প্রভাবিত করে? দুটি উদাহরণ দাও।

৪) ............. সামাজিক বিভিন্নতাগুলো গভীর সামাজিক বিভাজন ও উৎকণ্ঠা তৈরি করে। ......... সামাজিক বিভিন্নতাগুলো সাধারণত সংঘর্ষের দিকে ধাবিত করে না।

৫) সামাজিক বিভাজন নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে নীচের কোন বক্তব্যটি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সঠিক নয়?

ক) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কারণে সামাজিক বিভাজন রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়।

খ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের ক্ষোভগুলো ব্যক্ত করতে পারে।

গ) সামাজিক বৈচিত্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রই হল উৎকৃষ্ট পথ।

ঘ) গণতন্ত্র সব সময়ই সামাজিক বিভাজনের উপর ভিত্তি করে সমাজকে অনৈক্যের দিকে ঠেলে দেয়।

৬) নীচের দেওয়া বক্তব্যগুলো বিবেচনা কর।

ক) সামাজিক বিভাজন তখনই তৈরি হয় যখন সামাজিক বিভিন্নতাগুলো একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়।

খ) একজন ব্যক্তির বহুবিধ পরিচয় থাকা সম্ভব।

গ) ভারতের মত বড় দেশগুলোতেই সামাজিক বিভাজন বর্তমান।

নীচের কোন মন্তব্যটি বা মন্তব্যগুলো সঠিক।

অ) ক,খ এবং গ (আ) ক এবং খ (ই) খ এবং গ (ঈ) একমাত্র গ

৭) নীচের মন্তব্যগুলোকে যুক্তি অনুসারে সাজাও। নিম্নে বর্ণিত কোডগুলোর সাহায্যে সঠিক উত্তর বাছাই কর।

ক) কিন্তু সামাজিক বিভাজনের সকল রাজনৈতিক বহি:প্রকাশকে সব সময় বিপজ্জনক মনে করা ঠিক নয়।

খ) বেশিরভাগ দেশেই কোনো না কোনো প্রকারের সামাজিক বিভাজন বিদ্যমান।

গ) সামাজিক বিভাজনগুলোর প্রতি নিবেদন করার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।

ঘ) কিছু কিছু সামাজিক ভিন্নতা সামাজিক বিভাজনে পরিণত হয়।

অ) ঘ,খ,গ,ক (আ) ঘ,খ,ক,গ (ই) ঘ,ক,গ,খ (ঈ) ক,খ,গ,ঘ।

৮) নিম্নে প্রদত্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোনটি ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠা রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ক) বেলজিয়াম (খ) ভারত (গ) যুগোস্লাভিয়া (ঘ) নেদারল্যাণ্ড।

৯) নিম্নে উল্লেখিত ১৯৬৩ সালে দেওয়া মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের বিখ্যাত ভাষণের অংশ বিশেষ পড়। কোন ধরনের সামাজিক বিভাজন সম্পর্কে তিনি বলছেন? তার দু:খ এবং প্রত্যাশাগুলো কি কি ?

তুমি কি এই অধ্যায়ে উল্লেখিত মেক্সিকো অলিম্পিকের ঘটনা ও এই ভাষণের মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও?

"আমার স্বপ্ন যে একদিন আমার ছোট ছোট চার সন্তান এমন একটি দেশে বসবাস করবে যেখানে কোনো দিন তারা দেহের বর্ণের ভিত্তিতে নয় বরং চারিত্রিক আদর্শের দ্বারা বিবেচিত হবে। স্বাধীনতাকে স্বরূপে ফিরে আসতে দাও এবং এমনটা যখন ঘটবে, আমরা যখন স্বাধীনতাকে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে দেব — স্বাধীনতা যখন প্রতিটি গ্রাম, শহর, পল্লী এবং রাজ্যে রাজ্যে স্বরূপে আবর্তিত হবে তখনি স্বপ্নের সেইদিন দ্রুত প্রতীয়মান হবে যেদিন ঈশ্বরের সকল সন্তান-কৃষ্ণাঙ্গ, নারী ও পুরুষ, ইহুদি এবং অইহুদি, প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথোলিক সকলে মিলে পরস্পরের হাত ধরবে এবং নিগ্রোদের পরমার্থিক জ্ঞানের সেই শব্দগুলো গেয়ে যাবে : 'পরিশেষে মুক্তি! পরিশেষে মুক্তি!' পরমপিতা ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ, অবশেষে আমাদের মুক্তি হল।' আমার স্বপ্ন হল এমন একদিন আসবে যখন এই দেশ উঠে দাঁড়াবে এবং সুদৃঢ় বিশ্বাসের সত্যিকার বিকাশ হবে, ও সমস্বরে বলবে: আমরা এই চিরন্তন সত্যকে বিশ্বাস করি যে সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষই সমান।

অনুশীলনী

# লিঙ্গা, ধর্ম এবং জাতি
# Gender, Religion and Caste

অধ্যায়-৪

## সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Overview)

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সামাজিক বৈচিত্র্যেরা গণতন্ত্রের পক্ষে হুমকি হয়ে ওঠে না। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক বৈচিত্র্যের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ শুধুমাত্র সম্ভবই নয় বরং কখনো কখনো তা কাঙ্ক্ষিতও হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে আমরা উক্ত ধারণাটিকেই ভারতে অনুসৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রয়োগ করব। আমরা তিন ধরনের সামাজিক বৈচিত্র্যের কথা বলব যা কখনো কখনো সামাজিক বিভাজন ও বৈষম্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সামাজিক বৈচিত্র্যগুলো লিঙ্গা, ধর্ম এবং জাতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমরা বিভাজনের প্রকৃতি এবং কীভাবে এই বিভাজন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয় তার প্রতি আমরা লক্ষ রাখব। আমরা এটাও প্রশ্ন রাখব যে সামাজিক বিভাজনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রতিফলন ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে লাভজনক কিংবা ক্ষতিকর।

## লিঙ্গ ও রাজনীতি (Gender and politics)

© Zuban

নারীশক্তি প্রদর্শনকারী বাংলার একটি পোস্টার (দেওয়াল পত্র)।

চলো লিঙ্গ বিভাজন বা বৈষম্য দিয়েই আলোচনা শুরু করি। এটি হল এক ধরনের লিঙ্গাভিত্তিক সামাজিক বৈষম্য বা সামাজিক স্তর বিন্যাস, যা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় না। লিঙ্গা বৈষম্যকে মনে করা হয় একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যা অপরিবর্তনীয়। যাই হোক, বিষয়টি জীববিদ্যা নয় বরং সামাজিক প্রত্যাশা ও প্রথাগত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

### টীকা

**লিঙ্গাভিত্তিক শ্রমবিভাজন :** এটি এমন এক ব্যবস্থা যেখানে গৃহের অভ্যন্তরে সকল কাজ নারীরাই করে, অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাধ্যমে নারীরাই তা সম্পন্ন করে।

### সরকারি ও বেসরকারি বিভাজন (Public / Private division) :

ছোটোবেলা থেকেই ছেলে মেয়েদের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেওয়া হয় যে গৃহস্থালির কাজকর্ম সামলানো এবং শিশুদের লালন-পালন করাই মেয়েদের মূল দায়িত্ব। বেশিরভাগ পরিবারই লিঙ্গাভিত্তিক শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে এই ধারণাটির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায় যে মহিলারা রান্না-বান্না, বাড়িঘর পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া, সেলাই কাজ করা, ছেলেমেয়েদের যত্ন করা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে। গৃহের বাইরের সকল কাজ পুরুষরা সম্পন্ন করে। এর অর্থ এই নয় পুরুষরা ঘরের কোনো কাজ করতে পারে না। তবে তাদের সাধারণ ধারণা হল এই যে এই সকল কাজ শুধু মহিলারাই করবে। কিন্তু ওইসব কাজের জন্য যদি অর্থ পাওয়া যায় তবে পুরুষরাও সেই কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। হোটেলের বেশিরভাগ সেলাই কর্মী ও রাঁধুনি হল পুরুষ। অনুরূপভাবে এর অর্থ এই নয় যে মহিলারা ঘরের বাইরে কাজ করে না। গ্রামে মহিলারাই জল ও জ্বালানি সংগ্রহ করে এবং মাঠে কাজ করে। শহর এলাকায় গরিব মহিলারা মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিচারিকা হিসাবে কাজ করে। আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা বিভিন্ন অফিসে কাজ করে। তবে এটা লক্ষণীয় যে মহিলাদের অধিকাংশকেই অর্থ উপার্জনের জন্য বাহিরে কাজ করার পরেও ঘরের সকল কাজকর্ম সামলাতে হয়। কিন্তু পারিবারিক কাজের জন্য তারা কোনো পারিশ্রমিক কিংবা স্বীকৃতি কোনোটাই পায় না।

এ ধরনের শ্রম বিভাজনের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহিলারা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও জনজীবনে বিশেষ করে রাজনীতির অঙ্গানে তেমন কোনো ভূমিকা নিতে পারে না। অতীতে শুধুমাত্র পুরুষরাই সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করত, ভোট দিত এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারত, পর্যায়ক্রমে লিঙ্গা সম্পর্কিত বিষয়টি রাজনীতির আলোচ্য বিষয় হিসাবে উঠে আসে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নারীরা সমঅধিকারের জন্য সংগঠিত হয় এবং বিক্ষোভ

প্রদর্শন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভোটাধিকারের প্রাপ্তির লক্ষ্যে নারীরা গণসমাবেশের আয়োজন ও আন্দোলন শুরু করে। নিজেদের শিক্ষা ও পেশাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক ও আইনগত মর্যাদার সুরক্ষা সম্পর্কিত দাবিগুলো এসকল বিক্ষোভ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অনেক গোড়া নারী আন্দোলন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও নারীদের জন্য সমতার অধিকারকে মূল লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে। এই আন্দোলনগুলোকে বলা হয় নারীবাদী আন্দোলন।

লিঙ্গ বৈষম্যের রাজনৈতিক প্রতিফলন এবং এই বিষয়ে রাজনৈতিক প্রচার সমাবেশ জনজীবনে নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধিতে সহায়তা

© Zuban

**তুমি এদের কোন্‌টি?**

আমাদের সমাজের প্রচলিত একজন আদর্শ নারীর এই ভাবনাগুলোকে আলোচনা করো। তুমি কি এর কোনোটির সাথে একমত? যদি না হয়, তাহলে তোমার কল্পনায় একজন আদর্শ নারী কেমন?

## টীকা

**নারীবাদী** : এমন একজন নারী ও পুরুষ যে নারী-পুরুষের সমসুযোগ ও অধিকারের নীতিতে বিশ্বাস করে।

করেছে। বর্তমানে নারীদের মধ্যে অনেককেই বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, বাস্তুকার, আইনজীবী, ব্যবস্থাপক, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ইত্যাদি হিসাবে দেখতে পাই। এই পদগুলোতে পূর্বে নারীদের জন্য উপযোগী বলে মনে করা হত না।-

পৃথিবীর কিছু অংশে যেমন— সুইডেন, নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ডের মতো স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলোতে জনজীবনে নারীদের অংশগ্রহণের হার অনেক বেশি।

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে কিছুটা উন্নতি হলেও নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। আমাদের সমাজ এখনো পুরুষ প্রাধান্য ও পিতৃতান্ত্রিক। বিভিন্নভাবে নারীরা নানাহ প্রকারের অসুবিধা, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়।

- পুরুষদের মধ্যে ৭৬ শতাংশ স্বাক্ষরতার তুলনায় নারী সাক্ষরতার হার মাত্র ৫৪ শতাংশ। অনুরূপভাবে মহিলা বিদ্যার্থীদের খুব সামান্যই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের ফলাফলে আমরা দেখি ছেলেদের মতো মেয়েরাও ভালো

## চলো এটা করি

আমাদের দেশের ছয়টি রাজ্যে 'সময়ের ব্যবহারের' উপর একটি সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষাটি অনুযায়ী একজন মহিলা প্রতিদিন গড়ে সাড়ে সাত ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কাজ করে অথচ একজন পুরুষ সেখানে কাজ করে মাত্র সাড়ে ছয় ঘণ্টা। তবুও পুরুষদের দ্বারা করা কাজ বেশি চোখে পড়ে কারণ তাদের বেশিরভাগ কাজ পারিবারিক আর্থিক উপার্জনে ভূমিকা রাখে। মহিলারাও সংসারের প্রত্যক্ষ রোজগারে অনেক কাজ করে কিন্তু তারা বেশিরভাগ কাজ গৃহস্থালি সম্পর্কিত। এ কাজের জন্য তারা কোনো মজুরি পায় না এবং তা চোখেও পড়ে না।

প্রতিদিনের ব্যয় করা সময় (ঘণ্টা : মিনিট)

| কর্মকাণ্ড | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|
| উপার্জন সংক্রান্ত কাজ | ৬:০০ | ২:৪০ |
| গৃহস্থালি এবং এর সাথে সম্পর্কিত কাজ | ০:৩০ | ৫:০০ |
| গল্প-গুজব | ১ : ২৫ | ১ : ২০ |
| কর্মহীন / বিশ্রাম | ৩:৪০ | ৩:৫০ |
| নিদ্রা, নিজের যত্ন, পড়াশোনা ইত্যাদি | ১২:২৫ | ১১:১০ |

*উৎস — ভারত সরকার সময় ব্যবহার সমীক্ষা, ১৯৯৮-৯৯*

তোমার নিজের পরিবারেও অনুরূপ একটি সময়ের ব্যবহার বিষয়ক সমীক্ষা চালাতে পার। এক সপ্তাহ ধরে পরিবারের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাকে লক্ষ করো। অর্থ উপার্জনকারী কাজ (যেমন- ক্ষেত-খামার, দোকান, কারখানা, অফিস ইত্যাদিতে কাজ), গৃহস্থালি কাজ (রান্নাকরা, পরিষ্কার করা, ধোয়া-মোছা, জল সংগ্রহ করা, শিশু এবং বড়োদের যত্ন করা ইত্যাদি) আড্ডা, অবকাশ, ঘুম, নিজের যত্নআত্তি, পড়াশোনা ইত্যাদি কাজগুলোর জন্য প্রতিদিন কে কতটা সময় ব্যয় করছেন তা একটি খাতায় লিখে রাখো। প্রত্যেক সদস্যের প্রতিটি কাজের জন্য প্রতিদিন গড়ে কতটা সময় ব্যয় হয় তা বের করো। লক্ষ করো তোমার পরিবারেও কি মহিলারা বেশিক্ষণ কাজ করেন না?

### টীকা

***পিতৃতন্ত্র :*** স্বাভাবিক অর্থে এর অর্থ হল পিতার দ্বারা শাসন। পারিভাষিক অর্থে এটি এমন এক অবস্থা যেখানে নারীদের তুলনায় পুরুষের মূল্য ও ক্ষমতা বেশি বলে মনে করা হয়।

করছে, যদিও সামান্য কিছু ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়। কারণ পিতা-মাতারা কন্যা সন্তানদের তুলনায় ছেলেদের পড়াশোনার পেছনে বেশি ব্যয় করতে আগ্রহী।

- এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে উচ্চপদে আসীন এবং উচ্চবেতনভোগী মহিলাদের সংখ্যা এখনো অত্যন্ত নগণ্য। ভারতে একজন মহিলা পুরুষের তুলনায় গড়ে এক ঘণ্টা বেশি সময় কাজ করে। যদিও সে তার কাজের পারিশ্রমিক কিংবা স্বীকৃতি কোনোটাই পায় না।
- ১৯৭৬ সালের সম মজুরি আইন অনুযায়ী সম কাজের জন্য সম মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে খেলাধূলা ও সিনেমা থেকে খামার কিংবা কারখানা পর্যন্ত প্রায় সকল কর্ম ক্ষেত্রেই পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের কম মজুরি দেওয়া হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়ই পুরোপুরি সমান কাজ করে।
- ভারতের বিভিন্ন অংশে পিতামাতারা ছেলে সন্তানের প্রত্যাশা বেশি করে এবং জন্মের পূর্বেই কন্যা সন্তানকে গর্ভপাতের মাধ্যমে হত্যা করার উপায় খোঁজে। এরকম লিঙ্গ প্রবণ-গর্ভপাতের কারণে শিশুদের লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি হাজারে ছেলের তুলনায় মেয়ে শিশু) ভারতে বর্তমানে মাত্র ৯১৯। মানচিত্র অনুসারে পুরুষের তুলনায়

আগন্তুকদের মা সব সময় বলে, "আমি কোনো কাজ করি না। আমি একজন গৃহিণী।" কিন্তু আমি দেখি সে সব সময় অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে চলে। সে যা করে তা যদি কাজ না হয় তাহলে কাজ কাকে বলে?

এই মানচিত্রে তুমি কি তোমার জেলার অবস্থান চিহ্নিত করতে পার? এই খানে শিশু লিঙ্গের হার কত? বিভিন্ন রঙের চিত্রিত অন্যান্য জেলার তুলনায় জেলা কীভাবে আলাদা?

ঐ সকল প্রদেশগুলোকে চিহ্নিত করো যার বেশিরভাগ জেলার শিশু লিঙ্গের হার ৮৫০ এর নীচে।

এই মানচিত্রটিকে পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পোস্টারের সাথে তুলনা করো। কীভাবে মানচিত্র এবং পোস্টার উভয়টিই আমাদেরকে শিশু লিঙ্গের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করে?

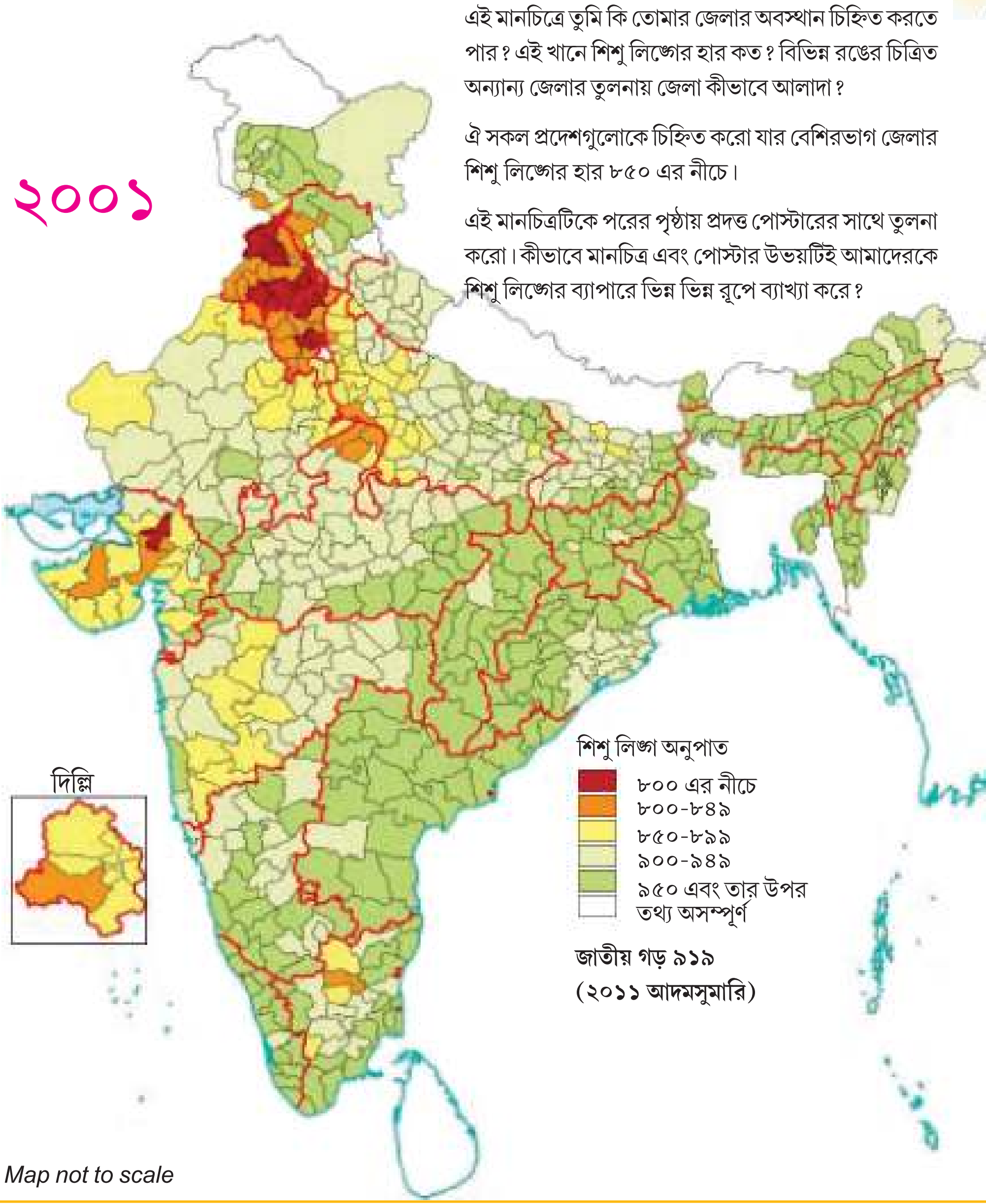

© Oxfam GB

নারীর সংখ্যা ৮৫০ এর নীচে নেমে এসেছে এবং কোথাও কোথাও এই সংখ্যা ৮০০ এর নীচে।

নারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের সহিংসতা শোষণ এবং নিপীড়নের খবর আমরা প্রত্যহ লক্ষ করি। বিশেষত: শহর অঞ্চলগুলো নারীদের জন্য বর্তমানে অনেকটাই অসুরক্ষিত। এমন কি তারা বাড়িঘরেও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং অন্যান্য প্রকারের পারিবারিক সহিংসতা থেকেও মুক্ত নয়।

## মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব (Women's Political representation)

এই সম্পর্কে সকলে জানে। তবুও নারী কল্যাণ বা মহিলা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এ কারণেই অনেক নারীবাদী, রাজনীতিবিদ ও নারী আন্দোলন কর্মীরা মনে করেন যে যতদিন না মহিলারা রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করতে বা অংশীদার হতে পারছে ততদিন তাদের সমস্যাগুলোকে কেউ গুরুত্ব দেবে না। তাদের মতে নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম উপায় হচ্ছে আরও বেশি সংখ্যক নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

ভারতের বিভিন্ন আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার অত্যন্ত কম। উদাহরণস্বরূপ ২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো লোকসভায় নির্বাচিত নারী সদস্যদের সংখ্যা মোট সদস্যের মাত্র ১২ শতাংশকে স্পর্শ করেছে। রাজ্য বিধান সভাগুলোতে নারী সদস্যদের অংশীদারিত্ব মাত্র ৫ শতাংশ। এই বিষয়ে নিম্নে অবস্থানকারী বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ভারতকেও গণনা করা হয়। (নীচের লেখচিত্রটি লক্ষ করলে তা স্পষ্ট হবে।)

ভারতে নারী প্রতিনিধিত্বের হার এত কম হওয়ার পেছনে তুমি কি কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছ? তুমি কি মনে কর ইউরোপ এবং আমেরিকায় নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অর্জিত অবস্থান সন্তোষজনক?

বিশ্বের বিভিন্ন অংশের জাতীয় আইনসভাগুলোতে নারী প্রতিনিধিত্ব (শতাংশ)

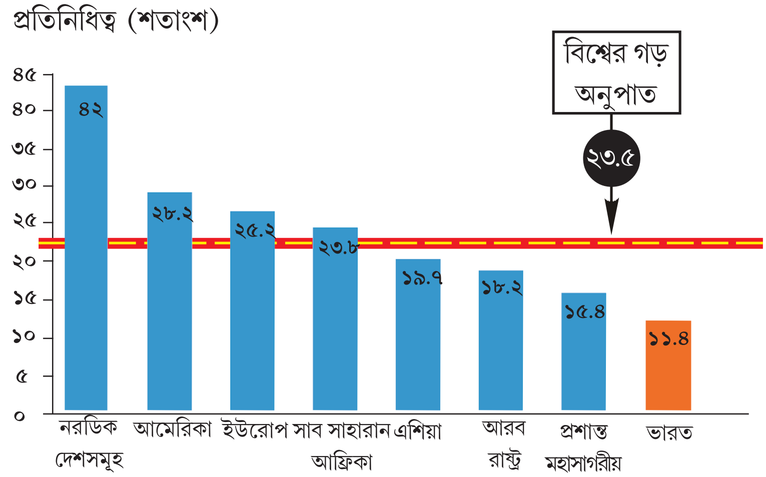


*১লা অক্টোবর ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত দ্রষ্টব্য: সংসদগুলোর নারী সদস্যদের অবস্থান সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।*

এক্ষেত্রে ভারত এখনো লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় অনুপাতের পেছনে রয়েছে। সরকারের ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই পুরুষ, যদিও সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা।

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের একটি পথ হল নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী সদস্যদের ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণের অনুপাত সুনিশ্চিত করতে আইনগত বাধ্যতামূলক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থায় বিষয়টিকে এভাবেই কার্যকর করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলোতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন আইনগতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমান ভারতে তাই গ্রাম এবং শহরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১০ লাখেরও বেশি নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

নারী সংগঠন ও নারীবাদী সক্রিয় কর্মীদের বর্তমান দাবি হল লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোতে অনুরূপভাবে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ধরনের প্রস্তাব সম্বলিত একটি বিল প্রায় এক দশক ধরে সংসদে পাশের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখনো কোনো সহমত গড়ে উঠেনি। ফলে বিলটি এখনো পাশ হয়নি।

লিঙ্গ-বিভাজন এমনই একটি উদাহরণ যে কিছু কিছু সামাজিক বৈষম্য রাজনীতিতে তার বহি:প্রকাশ ঘটা প্রয়োজন। সামাজিক বৈষম্যের কারণগুলো যখন রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হয় তখন এর মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলো উপকৃত হয়। তুমি কি মনে কর উপরে উল্লেখিত নারীদের সাফল্য অর্জন সম্ভব হত যদি না তাদের প্রতি বৈষম্যের বিষয়টি রাজনৈতিক অঙ্গানে উপস্থাপন করা হত?

যদি জাতিবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ খারাপ হয় তাহলে নারীবাদ কীভাবে ভালো হতে পারে? আমরা কেন এ সকল লোকেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি না, যারা জাতি, ধর্ম কিংবা লিঙ্গের ভিত্তিতে সমাজকে বিভাজিত করে?

© Surender - *The Hindu*

*এই ব্যাঙ্গাচিত্রটি এমন একটি অবস্থার ইঙ্গিত করে যে, কেন নারীদের জন্য সংরক্ষণ বিষয়ক বিলটি এখনো পর্যন্ত সংসদে পাশ হয়নি। তুমি কি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত?*

## ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও রাজনীতি
## (Religion, communalism and politics)

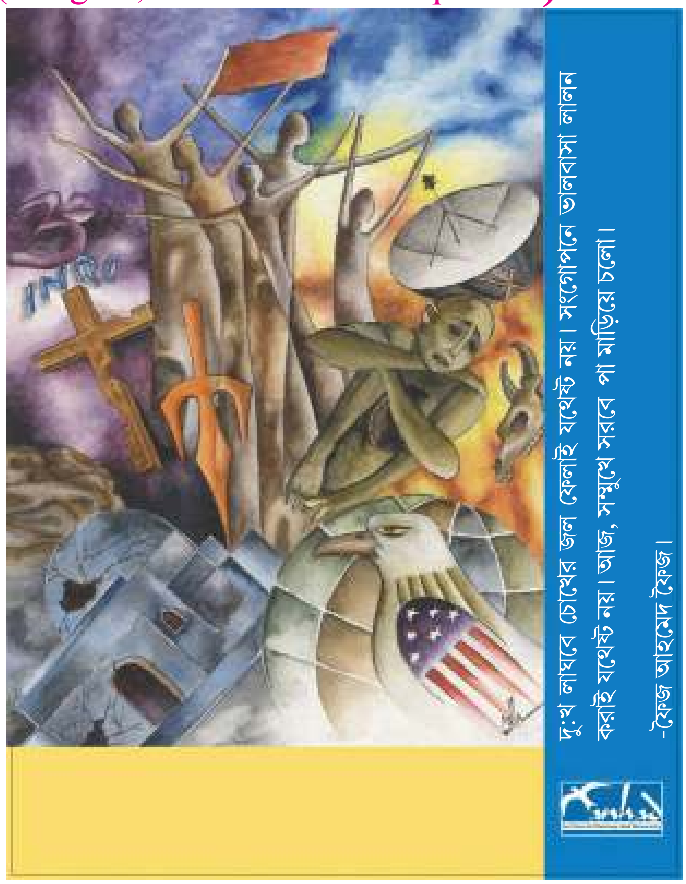


চলো এখন ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক বিভাজন নিয়ে আলোচনা করি। এই বিভাজনটি লিঙ্গা বৈষম্যের মতো এতটা সর্বজনীন নয়, যদিও ধর্মীয় বৈচিত্র্য আজ সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভারত এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ রয়েছে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সেখানে যদিও বেশিরভাগ মানুষ একই ধর্মে বিশ্বাস করে তবুও তাদের ধর্মীয় আচরণ পদ্ধতির মধ্যে আশ্চর্যজনক পার্থক্য বর্তমান। লিঙ্গা বৈষম্যের বিপরীতে ধর্মীয় বিভাজন রাজনীতির ময়দানে প্রায়ই জায়গা করে নেয়।

**নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করো :**

- গান্ধিজির মতে রাজনীতি থেকে ধর্মকে কখনও আলাদা করা যায় না। তিনি ধর্ম বলতে হিন্দু কিংবা ইসলামের মতো বিশেষ কোনো ধর্মকে বোঝাননি, বরং ওই সকল নৈতিক মূল্যবোধের কথা বলেছেন, যার মধ্যে সকল ধর্মেরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় নীতি আদর্শের ভিত্তিতেই রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত।

- আমাদের দেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ হল ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের। তারা দাবি করে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় সরকার যেন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

- নারীবাদী আন্দোলনকারীদের মতে সকল ধর্মেরই 'পারিবারিক নীতি' নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের কথা বলে। সুতরাং তারা দাবি করে যে, এই ধর্মের ধর্মীয় আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে যেন ন্যায়সঙ্গত করা হয়=

এই সকল উদাহরণগুলো রাজনীতি এবং ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। কিন্তু এগুলো খারাপ কিংবা ভয়ানক নয় ।বিভিন্ন ধর্মের নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা

পালন করতে পারে। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে যে-কোনো নাগরিক তার স্বার্থ, প্রয়োজন এবং অন্যান্য দাবিসমূহ রাজনীতির অঙ্গনে পেশ করার সামর্থ্য থাকা উচিত। যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী তাদের ধর্মীয় অনুশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, যাতে নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ ঠেকানো যায়। এই সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যায্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে।

## সাম্প্রদায়িকতাবাদ (Communalism)

এই ধরনের সমস্যা শুরু হয় যখন ধর্মকে জাতির ভিত্তি হিসাবে মনে করা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত উত্তর আয়ারল্যান্ডের উদাহরণটি জাতীয়তাবাদের প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিপদের কথা ব্যক্ত করেছে। এই সমস্যা আরো গভীর হয় যখন রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ একচেটিয়াভাবে সংগঠিত হয় এবং যখন একটি ধর্ম এবং তার অনুগামীরা অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এমনটা তখনই হয় যখন একটি ধর্ম বিশ্বাসকে অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা হয় এবং কোন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দাবিকে অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় ও যখন রাষ্ট্র ক্ষমতাকে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অন্য ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের এরূপ পক্ষপাতমূলক সংযোগকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বলে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এমন একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে ধর্মকে কোনো সামাজিক সম্প্রদায়ের প্রধান ভিত্তি বলে মনে করা হয়। সাম্প্রদায়িকতা নিম্নোক্ত চিন্তাগুলোকে যুক্ত করে গড়ে উঠে। যেমন-বিশেষ একটি ধর্মের অনুসারীরা একটি মাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তাদের মৌলিক স্বার্থগুলো সমান হবে। তাদের মধ্যকার যে-কোনো পার্থক্য নিজেদের সামাজিক জীবনে তুচ্ছ কিংবা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হবে। এই আদর্শ অনুসারে যে সকল লোক বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী তারা অনুরূপ সম্প্রদায়ভুক্ত হবে না। যদি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কোনো ধরনের সামঞ্জস্য থাকে সেগুলোকে মনে করা হবে অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয়, তাদের স্বার্থগুলো অবশ্যই পৃথক হবে যেখানে সংঘর্ষ অনিবার্য। চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদ এটাও বিশ্বাস করে যে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা একই জাতি রাষ্ট্রে সম অধিকার ভিত্তিক নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে পারবে না। হয় এদের যে-কোনো একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, অথবা এদের সকলেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে।

এ ধরনের বিশ্বাস মৌলিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত। যে-কোনো একটি ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমান স্বার্থ কিংবা প্রত্যাশা রাখে না। প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ধরনের পরিচয়, অবস্থান এবং ভূমিকা থাকে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভিন্ন দাবি থাকে। প্রত্যেকটি দাবিই বিবেচনা পাওয়ার অধিকার রাখে। সুতরাং ধর্মীয় বিষয় ছাড়া একই ধর্মের সকল অনুসারীদের এক সাথে বেঁধে রাখার প্রচেস্টার অর্থ হল সেই সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ দাবিকে উপেক্ষা করা।

**রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিভিন্ন রূপ হতে পারে :**

- সাম্প্রদায়িকতাবাদের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ প্রাত্যহিক জীবনের বিশ্বাসগত আচরণে পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর চিরাচরিত নিয়মাবলি, অন্যান্য ধর্মের তুলনায় নিজের ধর্মই শ্রেষ্ঠ-এজাতীয় বিশ্বাস ইত্যাদি যুক্ত। এ ঘটনাগুলো এতই স্বাভাবিক যে আমাদের গোচরে আসে না, অথচ আমরা এ ধরনের বিশ্বাস নিয়েই চলি।

- সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি প্রায়ই স্বধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের দিকে ধাবিত করে। যারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত তাদের দ্বারাই সংখ্যাগুরু আধিপত্যের রূপ গঠিত হয় । যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত তাদেরও আলাদা একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গঠনের প্রত্যাশা থাকে।

আমি প্রায়ই বিশেষ একটি ধর্মের লোকেদের নিয়ে মজা করি। একারণে আমি কি সাম্প্রদায়িক?

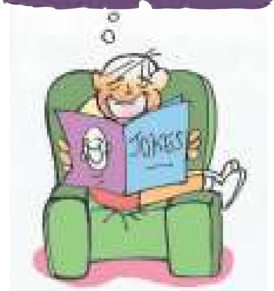


## টীকা

**পারিবারিক আইন :** ওই সকল আইন যেগুলো বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি পারিবারিক বিষয়গুলোর সাথে যুক্ত। আমাদের দেশে বিভিন্ন পারিবারিক আইন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

এত মেলামেশা
তবুও অপরিচিত
এত বৃষ্টির ফোঁটা
রক্তের দাগ তবুও সুরক্ষিত

— ফয়েজ

● ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা সাম্প্রদায়িকতার আরেকটি প্রাত্যহিক রূপ। এরসঙ্গে জড়িয়ে থাকে পবিত্র প্রতীকের ব্যবহার, ধর্মগুরুদের প্রভাব, আবেগিক আহ্বান, আধ্যাত্মিক ভয়ভীতির প্রচার যাতে একটি ধর্মের সকল অনুসারী রাজনৈতিক অঙ্গনে একজোট হয়। নির্বাচনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ ধর্মীয় আবেগ প্রচারের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য আবেদন করা হয়। এভাবে একটি বিশেষ ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের আবেগকে উসকে দেওয়া হয়।

● কখনো কখনো সাম্প্রদাকিতা তীব্র হিংসা, দাঙ্গা ও গণহত্যার রূপ নেয়। দেশ বিভাজনের সময় ভারত ও পাকিস্তানকে জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফল ভুগতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বড়ো আকারে সাম্প্রদায়িক হানাহানি সংগঠিত হয়েছে।

## ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State)

সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশের গণতন্ত্রের প্রতি একটি বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল এবং এখনো তা বর্তমান। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। যার ফলে তারা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাঠামোকেই বেছে নিয়েছেন। তাদের সিদ্ধান্ত সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় প্রতিফলিত হয়েছে, যা আমরা বিগত বছরে অধ্যয়ন করেছি।

● ভারতে কোনো রাষ্ট্র ধর্ম নেই। শ্রীলঙ্কায় যেমন বৌদ্ধধর্ম, ইংল্যান্ডে যেরকম খ্রিস্টধর্ম এবং পাকিস্তানে যেরকম ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেরকমভাবে আমাদের সংবিধানে কোনো ধর্মকেই বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

● আমাদের সংবিধান সকল ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে

যে-কোনো ধর্মে বিশ্বাস পূজা-প্রার্থনা, উপাসনা কিংবা যে-কোনো ধর্মকে প্রচারের স্বাধীনতা প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে কোনো ধর্মকে অনুসরণ না করার স্বাধীনতাও দিয়েছে।

- সংবিধান ধর্মের ভিত্তিতে কারোর প্রতি বৈষম্য করার ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।
- পাশাপাশি সংবিধান রাষ্ট্রকে ধর্মের ব্যাপারে কিছু ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অনুমোদন দিয়েছে যাতে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ পরিচর্যায় সমতা নিশ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ সংবিধান আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করেছে।

এই দৃষ্টিতে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো দল বা ব্যক্তির নিজস্ব মতাদর্শ নয়। এই ধারণা আমাদের দেশের মৌলিক ভিত্তির অন্যতম উপকরণ। সাম্প্রদায়িকতাকে কিছু ব্যক্তি বা ধর্মের প্রতি হুমকি হিসাবে দেখা ঠিক নয়। এটি মূলত সমগ্র ভারতীয় আদর্শের প্রতিই হুমকি স্বরূপ। এজন্যই সাম্প্রদায়িকতাকে যে-কোনো মূল্যে প্রতিহত করা উচিত। আমাদের দেশের মতো যে-কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানই সমাজের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাকে সামগ্রিকভাবে প্রতিহত করার জন্য শুধু সংবিধানই যথেষ্ট নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার ও অপপ্রচারকে বন্ধ করতে হবে এবং ধর্মের ভিত্তিতে জনগণকে রাজনৈতিক অঙ্গানে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করতে হবে।

© Ajith Ninan - *The Times of India*

*ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের আদর্শ হিসাবে এই আসনটিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। ... এতে এখানকার চারপাশ দারুণভাবে আন্দোলিত হবে!*

## জাতিভেদ প্রথা ও রাজনীতি (Caste and Politics)

পূর্বের দুটি উদাহরণে আমরা দেখেছি কীভাবে সামাজিক বিভাজন রাজনীতির অঙ্গানে প্রতিফলিত হয়। এর একটি বহুলাংশে ইতিবাচক এবং অন্যটি অনুরূপভাবে নেতিবাচক। এখন আমরা এর একটি চূড়ান্তরূপ নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হল জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি। এর অবশ্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে।

### জাতিগত বৈষম্য (Caste inequalities)

লিঙ্গ ও ধর্মের বিপরীতে জাতপাত ভিত্তিক বিভাজন ভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক সমাজেই কোনো না কোনো প্রকারের সামাজিক বৈষম্য কিংবা শ্রমবিভাজন রয়েছে। বেশিরভাগ সমাজেই বংশানুক্রমিক পেশা বর্তমান। এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ হল জাতিভেদ প্রথা। অন্যান্য সমাজের তুলনায় জাতিভেদ প্রথা এজন্য স্বতন্ত্র যে এই ব্যবস্থায় বংশপরম্পরাগত পেশা চলমান প্রথার দ্বারা সৃষ্টি হয়। সমগোত্রীয় সদস্যরা একটি সামাজিক সম্প্রদায় গড়ে তুলে। যারা একই পেশা বা বৃত্তি অনুসরণ করে, সমগোত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অন্য গোত্রের লোকেদের সাথে খাবার দাবারও পছন্দ করে না।

জাতপাত প্রথার মূল ভিত্তি হল বর্জন এবং অন্য গোত্রের প্রতি বৈষম্য। বর্জিত জনগোষ্ঠী অমানবিক প্রথা যেমন অস্পৃশ্যতার চরম শিকারে পরিণত হয়। এসম্পর্কে আমরা নবম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেছি। একারণেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সমাজ সংস্কারক যেমন জ্যোতিবা ফুলে, গান্ধিজি, বি আর আম্বেদকর এবং পেরিয়ার রামস্বামী-দের মতো মনীষীগণ এমন একটি সমাজ নির্মাণের ও প্রচারের চেষ্টা করেন যেখানে জাতপাত ভিত্তিক বৈষম্যের কোনো স্থান নেই।

## ভারতে সামাজিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য (Social and Religious Diversity of India)

প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর ভারতের জনগণনায় প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় পরিচয়ের উল্লেখ থাকে। জনগণনায় নিযুক্ত কর্মী প্রত্যেক বাড়িঘর পরিদর্শন করে এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ধর্ম পরিচয় তাদের বর্ণনা অনুসারে নথিভুক্ত করে। যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে সে 'ধর্মহীন' কিংবা 'নাস্তিক' তাহলে তার দেওয়া তথ্য অনুসারেই সেটি নথিভুক্ত হয়। সুতরাং দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাত এবং বছর বছর ধরে কীভাবে তা পরিবর্তন হয় সেই সম্পর্কে আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ রয়েছে। নীচের পাই চিত্রটি আমাদের দেশের ছয়টি প্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাত উপস্থাপন করেছে। স্বাধীনতার সময় থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা যথেষ্ট হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যায় তাদের অনুপাত খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। শতাংশের ক্ষেত্রে হিন্দু, জৈন এবং খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা ১৯৬১ সাল থেকে কিছুটা কমেছে। মুসলিম, শিখ এবং বৌদ্ধদের জনসংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একটি প্রচলিত ভুল ধারণা ও অপপ্রচার এই যে দেশের মুসলিম জনসংখ্যা অচিরেই দেশের অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি (যা সাচার কমিটি নামে বহুলভাবে পরিচিত) তাদের বিশেষ প্রতিবেদনে প্রমাণ করেছে যে দেশের মুসলিম জনসংখ্যা আগামী ৫০ বছরে কিছু বৃদ্ধি পেলেও তা কখনো ৩-৪ শতাংশের বেশি হবে না। এই তথ্য আবারো প্রমাণ করে যে সর্বোপরি দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা জনিত ভারসাম্য খুব বেশি একটা বিনষ্ট হবে না।

এই অবস্থা জাতপাত ভিত্তিক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সত্য। ভারতের জনগণনায় দুটি সামাজিক সম্প্রদায়ের তথ্যও উল্লেখ থাকে। একটি হল তপশিলি জাতি অন্যটি হল তপশিলি উপজাতি। এই দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে শত শত প্রকারের জাতি এবং উপজাতি গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাদের নাম সরকারি তপশিলে উল্লেখ আছে। সুতরাং তাদের নামের পূর্বে 'তপশিল' কথাটি যুক্ত থাকে। তপশিলি জাতি যারা সাধারণত দলিত নামে পরিচিত তারা ঐসকল গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা হিন্দু সামাজিক নিয়মে অচ্ছুত ছিল এবং অস্পৃশ্যতার অন্তরালে অভিশপ্ত ছিল। তপশিলি উপজাতি যারা 'আদিবাসী' নামে পরিচিত তারাও ঐ সকল সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে যারা সাধারণত পাহাড় পর্বতে কিংবা জঙ্গালে সামাজিকভাবে বর্জিত জীবন যাপন করে । এরা সমাজের বাকি অংশের সাথে খুব বেশি একটা মেলামেশা করেনা। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ১৬.৬ শতাংশ ছিল তপশিলি জাতি এবং ৮.৬ শতাংশ ছিল তপশিলি উপজাতি।

জনগণনা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে এখনো পর্যন্ত অন্যান্য পিছিয়েপড়া শ্রেণির কোনো স্বতন্ত্র হিসাবের উল্লেখ নেই। এই ধরনের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমরা নবম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেছি। সুতরাং দেশের মোট জনসংখ্যায় পিছিয়ে-পড়া সম্প্রদায়ের অনুপাত সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ২০০৪-০৫ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী দেশের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় ৪১ শতাংশ। অতএব তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মোট জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। যা দেশের মোট হিন্দু জনসংখ্যার চারভাগের তিন ভাগ।

*ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা—২০১১*

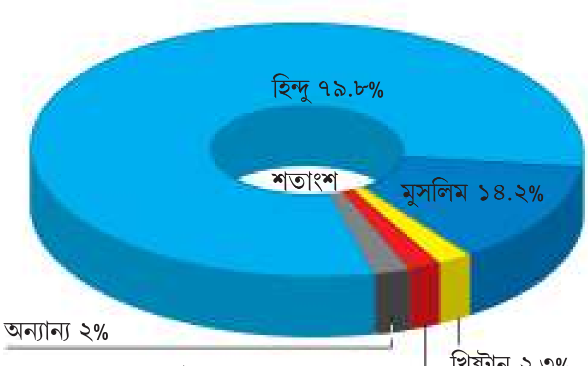


অন্যান্যদের মধ্যে বৌদ্ধ ০.৭%, জৈন ০.৪%, অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মমত ০.৭%, ধর্মপরিচয় দেওয়া হয়নি ০.২%।

*(উৎস ভারতের জনগণনা-২০১১)*

কিছুটা প্রচেষ্টা ও কিছুটা আর্থসামাজিক উন্নয়নের কারণে আধুনিক ভারতবর্ষে জাতি এবং জাতিভেদ ব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নগরায়ন, সাক্ষরতা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, পেশাগত ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ ভারতের জমিদারি ব্যবস্থা পতন ইত্যাদি কারণে পূর্বতন জাতপাত ভিত্তিক ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাস ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। বর্তমান সময়ের নগর জীবনে রাস্তায় আমাদের পাশে কে হাঁটছে, রেস্তোরাঁর পাশের টেবিলে কে কী খাচ্ছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ভারতের সংবিধান জাতপাত ভিত্তিক বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করেছে এবং প্রথাগত অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীতিগত ভিত্তি নির্মাণ করেছে। আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি যদি বর্তমান ভারতে নতুন করে ফিরে আসে তাহলে শতবর্ষব্যাপী এই নতুন বিবর্তন দেখে দারুনভাবে অবাক হবে।

জাতিভেদ প্রথা এখনো বর্তমান ভারত থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি। জাতিভেদ সংক্রান্ত কিছু কিছু সেকেলে ধারণা এখনো দেশের অনেক জায়গায় বর্তমান। এখনো দেশের বহু লোক কেবল স্বজাতির মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অস্পৃশ্য প্রথা পুরোপুরি বিলুপ্তি ঘটেনি। শত বছরের কুঅভ্যাসগুলোর বিষময় ফল আজও সমাজকে বিষাক্ত করে। পূর্বে যে সকল উঁচুজাতের লোক শিক্ষার সুযোগ পেত তারা আজও আধুনিক শিক্ষা লাভের সুবিধা ভালোমতই পাচ্ছে। অতীতে যে সকল গোষ্ঠী শিক্ষার সুযোগ পেত না অথবা যাদের শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল তাদের বেশিরভাগ আজও পিছিয়ে আছে। যার ফলে আমাদের দেশের শহরের মধ্যেবিত্তদের একটা বড়ো অংশ 'উচ্চবর্ণে'র মানুষদের নিয়েই গঠিত। জাতপাতের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার একটা নিবিড় সম্পর্ক এখনো রয়েছে। (৫২নং পৃষ্ঠার সারণিটি দেখো)।

## রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব
## (Caste in Politics)

সাম্প্রদায়িকতার মতো জাতপাতের অস্তিত্বের মূলেও এক ধরনের বিশ্বাস কাজ করে। এই বিশ্বাস অনুযায়ী জাতপাত ব্যবস্থাই সামাজিক সম্প্রদায় গঠনের একমাত্র ভিত্তি। তাদের চিন্তা অনুসারে একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত সকলেরই স্বার্থ এক এবং এই স্বার্থের সঙ্গে অন্যজাত বা ব্যক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়িকতার মতো এক্ষেত্রেও এই ধরনের বিশ্বাস আমাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু রাজনৈতিক চর্চার ক্ষেত্রে এটাই একমাত্র প্রাসঙ্গিক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

আমি আমার জাতিগত পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাই না। পাঠ্যবই-এ আমরা এসব নিয়ে কেন আলোচনা করছি? জাতপাত নিয়ে কথা বলে আমরা কি আসলে জাতিভেদ প্রথাকেই মান্যতা দিচ্ছি না?

তুমি তাহলে এখন এটা পছন্দ করছ না? তুমি কি আমাকে বলনি যেখানেই অবৈধ কর্তৃত্ব বর্তমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেটা নিয়েই আমরা আলোচনা করব? আমরা চুপ থাকলে জাতপাত প্রথার কি বিলুপ্তি ঘটবে?

**রাজনীতিতে জাতপাত ভিত্তিক প্রভাবের বিভিন্ন রূপ হতে পারে:**

- নির্বাচনের জন্য যখন রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী বাছাই করে, তখন তারা নির্বাচকমণ্ডলীর জাতিগত বিন্যাসের বিষয়টি মাথায় রাখে এবং বিভিন্ন জাতির থেকে এমন প্রার্থী বাছাই করে যাতে তারা প্রয়োজনীয় সমর্থন পেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে। যখন সরকার গঠন করা হয় তখনও রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধিদের বিষয়টি মাথায় রাখে এবং সে অনুযায়ী সরকারের মন্ত্রিসভায় তাদের স্থান করে দেয়।
- নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রার্থীরা জাতিগত অনুভূতিতে সুড়সুড়ির মাধ্যমে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল জ্ঞাতসারেই কিছু কিছু

## টীকা

**নগরায়ন :—** গ্রামীণ এলাকা থেকে নগর এলাকায় স্থানান্তর।

**পেশাগত সক্রিয়তা :—** এক পেশা থেকে অন্য পেশায় যুক্ত হওয়া। এটা সাধারণত তখনি ঘটে যখন নব প্রজন্ম তাদের বংশ ও পরম্পরাগত পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগদান করে।

**জাতিভিত্তিক ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাস :—** অনেকটাই সিঁড়ির মতো গঠন যেখানে সকল সামাজিক গোষ্ঠী সমূহকে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন স্থান করে দেওয়া হয়।

## বর্তমান ভারতের জাতিগত বৈষম্য (Caste inequality today)

জাতিভেদ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের অন্যতম উৎস। কারণ এই ব্যবস্থাটি বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক উৎস নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ অতীতে তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' জাতিদের কোনো ভূমির অধিকার ছিল না এবং তথাকথিত 'দ্বিজ'দের শিক্ষার অধিকার ছিল। যদিও এ ধরনের জাতিভিত্তিক স্পষ্ট এবং আনুষ্ঠানিক বৈষম্য বর্তমানে সম্পূর্ণ অবৈধ তবুও শতবর্ষব্যাপী পুঞ্জীভূত সুবিধা ও বঞ্চনার প্রভাব এখনো পরিলক্ষিত হয়। আবার নতুন ধরনের বৈষম্যও সমাজে এখন দৃশ্যমান।

জাতি এবং অর্থনৈতিক মর্যাদার মধ্যে যে সম্পর্ক এতকাল প্রবহমান ছিল তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে প্রত্যেক উচ্চ কিংবা নিম্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অতিবিত্তবান ও অতি দরিদ্র উভয় শ্রেণিরই লোক পাওয়া যায়। আজ থেকে প্রায় বিশ-তিরিশ বছর আগেও এই অবস্থা পরিলক্ষিত হত না। যদিও একথা সত্য যে নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে ধনী লোকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে কম। তবে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রমাণ করে যে বর্ণবাদ এখনো বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক মর্যাদার সাথে প্রবলভাবে জড়িত :

- বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক গড় অবস্থা (মাসিক খরচ বা ব্যয়ের উপরে ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়েছে) এখনো পুরানো ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাস প্রথা অনুসরণ করে চলেছে। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের লোকেরা সর্বোচ্চ স্থানে, নিম্নবর্ণের লোকেরা অর্থাৎ দলিত এবং আদিবাসীরা সর্বনিম্ন স্থানে ও অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির লোকেরা মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছে।
- যদিও প্রত্যেক বর্ণ বা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই দরিদ্র জনগণ রয়েছে, তবে অতিদরিদ্র লোকসংখ্যার অনুপাতের (সরকারিভাবে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী) হার নিম্ন বর্ণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি, অথচ উচ্চবর্ণের মধ্যে অত্যন্ত কম এবং আগের মতোই অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অবস্থান এদের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে।
- যদিও প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই এমন কিছু লোক রয়েছে যারা অত্যন্ত বিত্তশালী। এদের সংখ্যা উচ্চবর্ণের মধ্যে যতবেশি নিম্নবর্ণের মধ্যে ততটাই শোচনীয়ভাবে কম।

*দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত, ১৯৯৯-২০০০*

| জাতি এবং সম্প্রদায় | গ্রাম | নগর |
|---|---|---|
| তপশিলি উপজাতি | ৪৫.৮ | ৩৫.৬ |
| তপশিলি জাতি | ৩৫.৯ | ৩৮.৩ |
| অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি | ২৭.০ | ২৯.৫ |
| মুসলিম উচ্চবর্ণ | ২৬.৮ | ৩৪.২ |
| হিন্দু উচ্চবর্ণ | ১১.৭ | ৯.৯ |
| খ্রিস্টান উচ্চবর্ণ | ৯.৬ | ৫.৪ |
| উচ্চবর্ণ শিখ | ০.০ | ৪.৯ |
| অন্যান্য উচ্চবর্ণ | ১৬.০ | ২.৭ |
| সকল সম্প্রদায় | ২৭.০ | ২৩.৪ |

**টীকা :** এখানে 'উচ্চবর্ণ' অর্থ হল ওই সকল লোক যারা তপশিলি জাতি, উপজাতি কিংবা অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়। দারিদ্র সীমার নীচে কথাটির দ্বারা ঐসকল লোকেদের বোঝানো হয়েছে যারা গ্রামে প্রতিমাসে মাথাপিছু ৩২৭ টাকা এবং শহরে ৪৫৪ টাকা বা তার নীচে খরচ করে।

*উৎস : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (NSSO) ভারত সরকার, ৫৫তম রাউন্ড, ১৯৯৯-২০০০*

জাতিগোষ্ঠীর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে এবং নিজেদেরকে ঐ গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে।

- সর্বজনীন ভোটদান পদ্ধতি এবং এক ব্যক্তি - এক ভোটনীতি রাজনৈতিক দলসমূহকে নিজেদের অনুকূলে রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে জনসমাবেশ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সচেষ্ট হতে বাধ্য করেছে। ওই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এখনো পর্যন্ত চলে আসা ধারণা যেমন নীচু বা নিকৃষ্টতর ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে।

রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব এতটাই বেশি থাকে যে কখনো কখনো মনে হয় জাতি কিংবা বর্ণকে কেন্দ্র করেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর অন্য কিছুর জন্যে নয়। তবে নীচের বিষয়গুলো বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এই বক্তব্যটি সত্যের কাছাকাছিও নেই।

- ভারতে এমন কোনো সংসদীয় ক্ষেত্র নেই যেখানে একটি মাত্র জাতি বা বর্ণের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রত্যেক দল এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকেই এক বা একাধিক জাতি ও সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করে।

- কোনো দলই নির্দিষ্ট একটি জাতি বা গোষ্ঠীর সকল ভোট লাভ করতে পারে না। যখন মানুষ একথা বলে যে এই সম্প্রদায়টি বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের 'ভোট ব্যাংক'-এর অর্থ হল এই সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ জনগণ ওই দলটির সপক্ষে ভোটদান করে।

- বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল একটি সম্প্রদায় থেকেই তাদের নির্বাচনী প্রার্থী মনোনীত করে। (যদি দেখা যায় গোটা সংসদীয় ক্ষেত্রের ওই সম্প্রদায় বা জাতির লোকেরা সংখ্যার দিক থেকে প্রাধান্য বিস্তার করে) অনেক নির্বাচক মণ্ডলী লক্ষ করেন যে তাদের সম্প্রদায় থেকে এক বা একাধিক প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছে। আবার অনেক নির্বাচক মণ্ডলী এটাও লক্ষ করেন যে তাদের সম্প্রদায় থেকে কোনো প্রার্থী মনোনীত করা হয়নি।

- আমাদের দেশে শাসক দল, সাংসদ বা বিধানসভার সদস্যরা প্রায়ই নির্বাচনে পরাজিত হয়। এটা কখনো সম্ভব হত না যদি সকল জাতি কিংবা সম্প্রদায় তাদের রাজনৈতিক অগ্রাধিকার বিবেচনার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকত।

স্পষ্টতই যেভাবে জাতিবাদ নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে একইভাবে অন্যান্য কারণেও অনুরূপভাবে প্রভাব ফেলে। কখনো কখনো নির্বাচকমণ্ডলীদের আন্তরিক আবেগ নিজ জাতি বা সম্প্রদায়ের থেকেও রাজনৈতিক দলের প্রতি শক্তিশালী হয়। সমজাতি বা সম্প্রদায়ের লোকেদের অর্থনৈতিক অবস্থান ভিত্তিক স্বার্থ বিভিন্ন প্রকারের হয়। একই জাতির মধ্যে ধনী এবং দরিদ্র, পুরুষ ও মহিলা প্রায়ই ভিন্নভাবে তাদের ভোট প্রদান করে। সরকার কিংবা জনপ্রিয় নেতাদের কর্মক্ষমতার উপরে জনগণের মূল্যায়ন প্রায়ই নির্বাচন ব্যবস্থার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মূল কারণ হিসাবে কাজ করে।

## জাতিবাদে রাজনীতির প্রভাব (Political in Caste)

আমরা এপর্যন্ত লক্ষ করেছি যে কীভাবে জাতিবাদ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। কিন্তু এর অর্থ এই

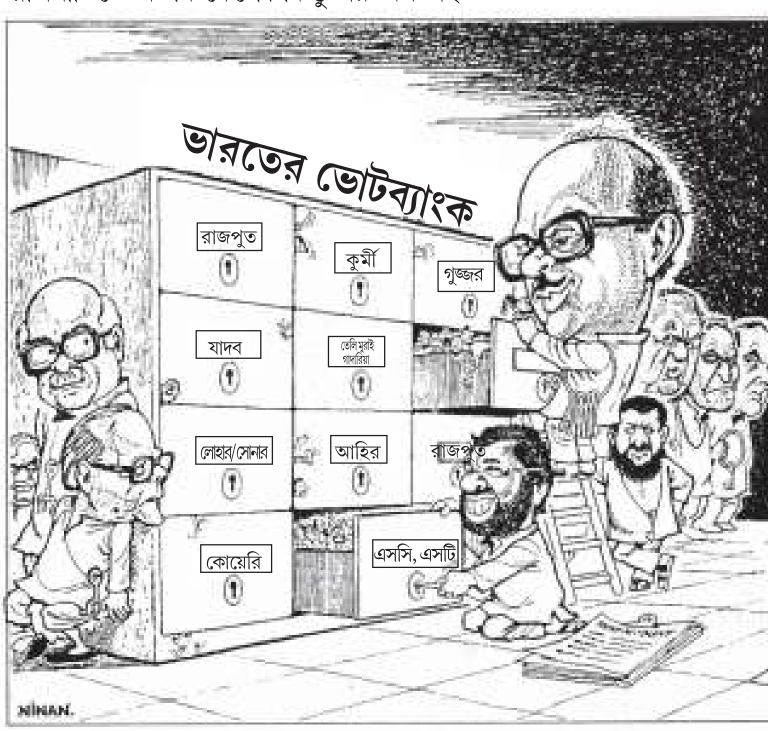


*তুমি কি মনে কর কোনো একটি জাতির জনগণকে ভোটব্যাংক হিসাবে দেখা রাজনৈতিক নেতাদের জন্য সঠিক?*

## গুপ্তবর্ণবাদ

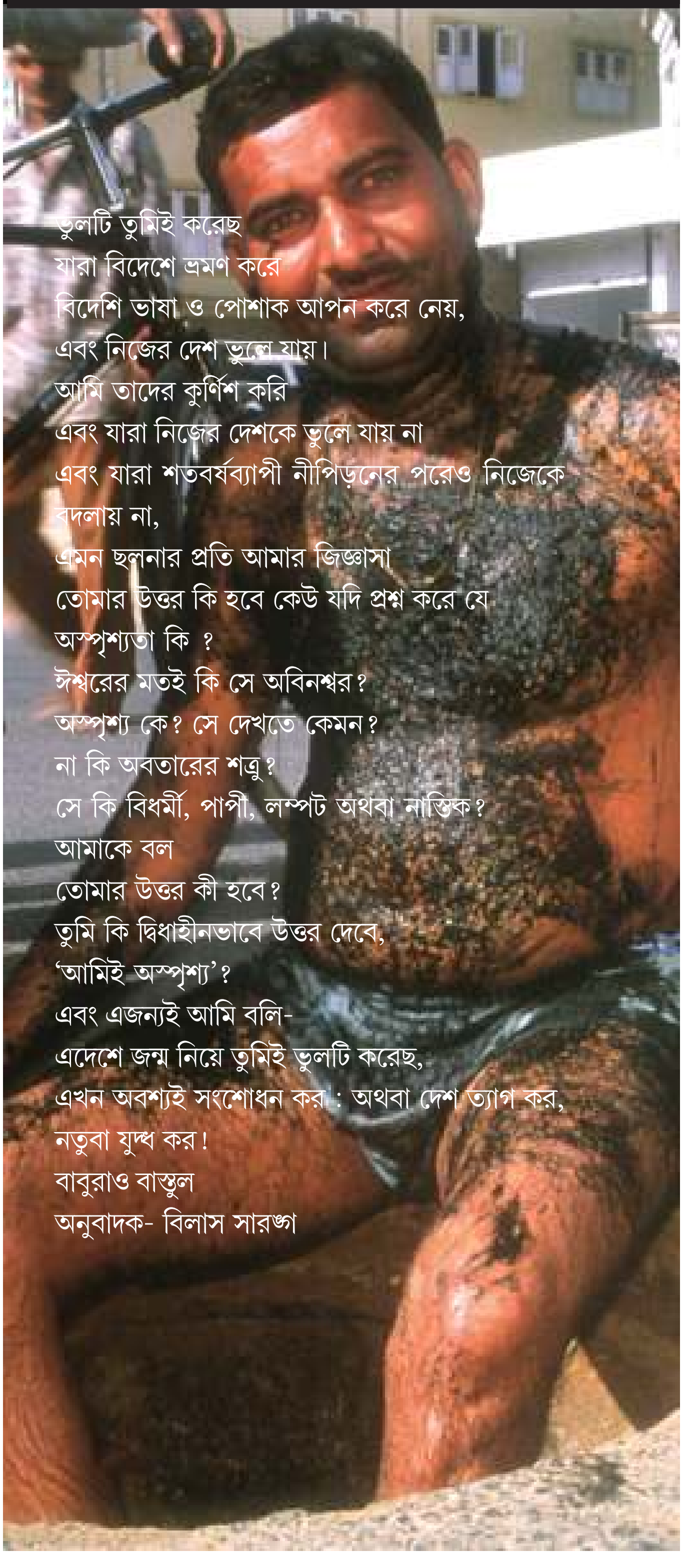

ভুলটি তুমিই করেছ
যারা বিদেশে ভ্রমণ করে
বিদেশি ভাষা ও পোশাক আপন করে নেয়,
এবং নিজের দেশ ভুলে যায়।
আমি তাদের কুর্ণিশ করি
এবং যারা নিজের দেশকে ভুলে যায় না
এবং যারা শতবর্ষব্যাপী নীপিড়নের পরেও নিজেকে
বদলায় না,
এমন ছলনার প্রতি আমার জিজ্ঞাসা
তোমার উত্তর কি হবে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে
অস্পৃশ্যতা কি ?
ঈশ্বরের মতই কি সে অবিনশ্বর?
অস্পৃশ্য কে? সে দেখতে কেমন?
না কি অবতারের শত্রু?
সে কি বিধর্মী, পাপী, লম্পট অথবা নাস্তিক?
আমাকে বল
তোমার উত্তর কী হবে?
তুমি কি দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দেবে,
'আমিই অস্পৃশ্য'?
এবং এজন্যই আমি বলি-
এদেশে জন্ম নিয়ে তুমিই ভুলটি করেছ,
এখন অবশ্যই সংশোধন কর : অথবা দেশ ত্যাগ কর,
নতুবা যুদ্ধ কর!
বাবুরাও বাস্তুল
অনুবাদক- বিলাস সারঙ্গা

নয় জাতি এবং রাজনীতির মধ্যে এই একটি মাত্র সম্পর্কই বিদ্যমান। রাজনীতি ও জাতিবাদ কিংবা জাতিসত্ত্বায় প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে নিয়ে আসে। সুতরাং রাজনীতিকে জাতিকরণ করা হয়নি বরং জাতিকে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। এ অবস্থার বিভিন্ন রূপ রয়েছে যেমন :

- এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি জাতি তাদের আশপাশের অন্যান্য জাতি ও উপ-জাতিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিজেদের পরিসর বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। অথচ পূর্বে এসকল উপজাতিদের বর্জন করা হত।
- বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলো অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে জোট গঠন করে আলোচনা ও মীমাংসায় উপনীত হয়।
- এই ব্যবস্থায় রাজনীতির অঙ্গানে নতুন নতুন জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যেমন- 'পশ্চাৎপদ শ্রেণি' এবং 'অগ্রসর মান' শ্রেণি।

সুতরাং জাতি বা বর্ণ রাজনীতিতে বিভিন্ন প্রকারের ভূমিকা রাখে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্যতা রাজনীতিতে সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলোকে ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে দাবী রাখার সুযোগ করে দেয়। এই অর্থে জাতিবাদি রাজনীতি দলিত এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণির জনগণকে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠনসমূহ বহুদিন ধরে জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাছাড়া সুবিধা বঞ্চিত জাতিগুলোর মর্যাদা, ভূমি ও সম্পদের অধিকার এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবিও করা হচ্ছে।

একই সময়ে, জাতিবাদী রাজনীতির প্রতি অতি সক্রিয়তা নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মতো জাতি ভিত্তিক রাজনীতিও গণতন্ত্রের জন্য হিতকর নয়। এই ধরনের অতি সক্রিয়তা উন্নয়ন, দারিদ্রতা এবং দুর্নীতির মতো জ্বলন্ত বিষয়গুলো চাপা পড়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতিগত বিভাজন বিভিন্ন উত্তেজনা, বিবাদ এমনকি সহিংসতার জন্ম দিতে পারে।

# অনুশীলনী

১) ভারতীয় জনজীবনের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করো যেখানে মহিলারা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়।

২) সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে আলোচনা করো। প্রত্যেকটি রূপের একটি করে উদাহরণ দাও।

৩) ভারতের জাতিগত বৈষম্য এখনো কীভাবে বর্তমান আলোচনা করো।

৪) ভারতে জাতিগত রাজনীতি একচেটিয়াভাবে নির্বাচনী ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে না এর দুটি কারণ নিয়ে আলোচনা করো।

৫) ভারতের আইনসভাগুলোতে নারী প্রতিনিধিত্বের অবস্থা কী?

৬) ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র - এ সম্পর্কিত যে-কোনো দুটি সাংবিধানিক ধারা নিয়ে আলোচনা কর।

৭) যখন আমরা লিঙ্গ-বৈষম্যের কথা বলি তখন এর অর্থ হয় —

ক) নারী এবং পুরুষের মধ্যে শারীরিক ভিন্নতা।

খ) সমাজ দ্বারা প্রদত্ত নারী-পুরুষের অসম ভূমিকা।

গ) অসম শিশু লিঙ্গ অনুপাত।

ঘ) গণতন্ত্রে নারীদের ভোটাধিকার না থাকা।

৮) ভারতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে —

ক) লোকসভায়।

খ) রাজ্য বিধানসভায়।

গ) ক্যাবিনেটগুলোতে।

ঘ) পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

৯) নীচের দেওয়া বক্তব্যগুলোকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করো। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা হল:-

ক) একটি ধর্ম অপর ধর্মগুলো থেকে শ্রেষ্ঠ।

খ) বিভিন্ন ধর্মের জনগণ একসাথে সমতার ভিত্তিতে শান্তির সাথে বসবাস করে।

গ) একটি নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীরা মিলে একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলে।

ঘ) একটি ধর্মকে অন্য ধর্মসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করা যাবে না।

কোন্ বক্তব্যটি বা বক্তব্যগুলো সঠিক?

(অ) ক, খ, গ এবং ঘ (আ) ক, খ এবং ঘ (ই) ক এবং গ (ঈ) খ এবং ঘ।

১০) নীচের কোন্ বক্তব্যটি ভারতের সংবিধানের ক্ষেত্রে ভুল? ভারতীয় সংবিধান :

ক) ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করেছে।

খ) একটি ধর্মকে সরকারি ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে।

গ) সকল নাগরিককে যে-কোনো ধর্ম অনুসরণ করার অধিকার প্রদান করেছে।

ঘ) সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জন্য সমতা নিশ্চিত করেছে।

১১) ---------- এর ভিত্তিতে গড়ে উঠা সামাজিক বৈষম্যগুলো একমাত্র ভারতেই দেখা যায়।

১২) প্রথম তালিকাটিকে দ্বিতীয় তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখো এবং প্রদত্ত কোডগুলোর সাহায্যে সঠিক উত্তর বাছাই করো।

| | প্রথম তালিকা | দ্বিতীয় তালিকা |
|---|---|---|
| ১ | যে ব্যক্তি নারী পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ বিশ্বাস করে। | (অ) সাম্প্রদায়িক |
| ২ | যে ব্যক্তি বলে যে ধর্ম হল সম্প্রদায় গঠনের প্রধান ভিত্তি | (আ) নারীবাদী। |
| ৩ | যে ব্যক্তি মনে করে জাতি বা বর্ণ হল সম্প্রদায় গঠনের প্রধান ভিত্তি | (ই) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। |
| ৪ | যে ব্যক্তি ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে অন্য কারোর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে না। | (ঈ) জাতি বা বর্ণবাদী। |

| | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|---|
| (ক) | আ | ই | অ | ঈ |
| (খ) | আ | অ | ঈ | ই |
| (গ) | ঈ | ই | অ | আ |
| (ঘ) | ই | অ | আ | ঈ |

# গণসংগ্রাম ও আন্দোলন
# Popular Struggles and Movements

## সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Overview)

বিগত অধ্যায়গুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার অংশীদারিত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা এটাও আলোচনা করেছি যে কীভাবে বিভিন্ন স্তরের সরকার ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলো ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে। এই অধ্যায়ে আমরা একই আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখব। পাশাপাশি লক্ষ রাখব কীভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের উপর আরোপিত বিভিন্ন চাপ ও প্রভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। গণতন্ত্রে স্বার্থ ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এই ধরনের মতাদর্শগত পার্থক্যগুলো সংঘবদ্ধ উপায়ে ব্যক্ত করা হয়। ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকগোষ্ঠীকে তাই এসকল পরস্পর বিরোধী চাহিদা ও চাপের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে হয়। আমরা এই অধ্যায়টি শুরু করব এমন একটি আলোচনা দ্বারা যেখানে দেখব, কীভাবে পরস্পর বিরোধী চাহিদা ও চাপ সম্পর্কিত চলমান গণসংগ্রামগুলো গণতন্ত্রকে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছে। এই আলোচনায় বিভিন্ন সংগঠন ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবে, যাদের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকগণ গণতন্ত্রে তাদের ভূমিকা রাখতে পারে। এই অধ্যায়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও গণসংগ্রাম সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখব, যারা রাজনীতিকে অপ্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এভাবেই আমরা পরের অধ্যায়ে রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের সরাসরি উপায় সম্পর্কে জানতে পারব।

অধ্যায় - ৫

# নেপাল ও বলিভিয়ার গণআন্দোলন

## Popular struggles in Nepal and Bolivia

পোলাণ্ডে গণতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কিত ঘটনাটির কথা কি তোমার মনে পরে? আমরা গত বছর নবম শ্রেণির পাঠ্যবই-এ প্রথম অধ্যায়ে এবিষয়টি সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি। এই ঘটনাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পথে কীভাবে জনগণ ভূমিকা রাখে। চলো এধরনের দুটি সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে জানি এবং দেখি গণতন্ত্রে কীভাবে ক্ষমতার অনুশীলন করা হয়।

### নেপালে গণতন্ত্রের রাজ্য আন্দোলন

(Movement for democracy in Nepal)

২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে নেপাল একটি অভূতপূর্ব গণআন্দোলন প্রত্যক্ষ করে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্রকে পুন:প্রতিষ্ঠান করা। তোমাদের হয়তো মনে আছে যে নেপাল ছিল একটি 'তৃতীয় তরঙ্গের' (Third wave) দেশ যে ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র অর্জন করেছিল। যদিও এই ব্যবস্থায় রাজা নাম মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে থেকে যায়, তবে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করত জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। রাজা বীরেন্দ্র একচেটিয়া রাজতন্ত্র থেকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ২০০১ সালে রহস্য জনক রাজপরিবারে সংগঠিত গণহত্যায় তিনিও নিহিত হন। নেপালের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান রাজা জ্ঞানেন্দ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের দুর্বলতা ও অ-জনপ্রিয়তার সুযোগ নেন। ২০০৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে রাজা প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেন এবং পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন। ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসের বিশাল গণআন্দোলন ছিল রাজাদের একাধিপত্বের বিপরীতে সরকারের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ পুন:প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

© Min Bajarachya

*নেপালের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জনগণ দেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার দাবীতে সমাবেশরত।*

সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো মিলে একটি সাত দলের জোট (SPA) গঠন করে এবং দেশের রাজধানী শহর কাঠমাণ্ডুতে চারদিনব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। এই প্রতিবাদ আন্দোলন হঠাৎ করে অনির্দিষ্ট কালব্যাপী হরতাল আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় যেখানে মাও বিদ্রোহীরা সহ বিভিন্ন সংগঠন এসে একসাথে জড়ো হয়। আরোপিত কারফিউ অমান্য করে জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার দাবীতে প্রতিদিন লক্ষ লোক জমায়েত হতে লাগল, যাদের নিয়ন্ত্রণের সামর্থ নিরাপত্তা বাহিনীর ছিল না। ২১শে এপ্রিল তারিখে প্রতিবাদী জনগণের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ লাখে পৌঁছায়। সেদিন তারা নেপালের রাজাকে একটি চরমপত্র প্রদান করে। রাজার প্রদত্ত অর্ধেক দাবী পূরণের সুপারিশ গণআন্দোলনের নেতারা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে। সংসদ পুনর্গঠন, সর্বদলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা প্রদান এবং একটি নতুন গণপরিষদ গঠন ইত্যাদি দাবীর প্রতি আন্দোলনকারীরা অনড় থাকে।

২০০৬ সালের ২৪শে এপ্রিল অর্থাৎ চরম সময় সীমার শেষ দিনে রাজা তাদের সকল দাবী পূরণে বাধ্য হলেন। সাতদলীয় জোট গিরিজা প্রসাদ কৈরালাকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করেন। পুন:প্রতিষ্ঠিত সংসদ নতুন অধিবেশনে মিলিত হয়ে রাজার থেকে বেশিরভাগ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ করে। সাত দলীয় জোট এবং মাওবাদীরা নতুন গণপরিষদ গঠন সম্পর্কিত একটি সমঝোতায় উপনীত হলেন। ২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে নেপাল একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ২০১৫ সালে নেপাল নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। নেপালের মানুষের এই আন্দোলন বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রেমীদের কাছে অনুপ্রেরণার এক অন্যতম উৎস।

## টীকা

**মাওবাদী (Maoists) :** ঐ সকল সাম্যবাদী লোক যারা চীনা বিপ্লবী নেতা মাও সে তুং এর মতাদর্শে বিশ্বাস করে। তারা সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সরকার উৎখাত করে সেখানে শ্রমিক এবং কৃষকদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

## বলিভিয়ার জলযুদ্ধ (Bolivia's Water War) :

পোলাণ্ড এবং নেপালের ঘটনা গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার যে কোনো সংগ্রামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই গণসংগ্রামগুলোর ভূমিকা শেষ হয় না। বলিভিয়ায় পানীয় জলের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণের স্বত:স্ফূর্ত ও সকল সংগ্রাম আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এই গণসংগ্রামগুলো যে কোনো দেশে গণতন্ত্র অনুশীলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বলিভিয়া হল লাতিন আমেরিকার একটি দরিদ্র দেশ। সে দেশের সরকার যাতে পৌর জল বণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেয় সেজন্য বিশ্বব্যাঙ্ক ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। সরকার বাধ্য হয়ে কোচাবাম্বা শহরে জলবণ্টনের স্বত্ব একটি বহুজাতিক কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দেয়। এই সুযোগে কোম্পানী অল্প সময়ের মধ্যে চারবার জলের দাম বৃদ্ধি করে। বেশিরভাগ মানুষ ১০০০ টাকা মূল্যের জলের মাসিক রসিদ পেল, অথচ ঐ দেশের জনগণের মাসিক গড় আয় হল ৫০০০ টাকা। এই অবস্থা জনগণকে স্বত:স্ফূর্ত প্রতিবাদ আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে।

২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রমিক, মানবাধিকার কর্মী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের সমন্বয়ে একটি নতুন জোট গঠন করা হয়, যারা ঐ শহরে চারদিনব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের কর্মসূচি সফলভাবে সংগঠিত করে। সরকার তাদের সাথে আলোচনায় রাজী হলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। যদিও এতে কোনো কিছু লাভ হয়নি। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিবাদ আন্দোলন যখন আবার শুরু হল তখন পুলিশ ভয়ানক অত্যাচার শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় এপ্রিল মাসে আবারো ধর্মঘট পালন করা হয় এবং সাথে সাথে সরকার সামরিক আইন জারি করে। কিন্তু জনগণের প্রবল প্রতিবাদী আন্দোলনের মুখে বহুজাতিক কোম্পানীর কর্মচারীরা শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। তাছাড়া সরকারেরও প্রতিবাদীদের সকল দাবী পূরণ করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। বহুজাতিক কোম্পানীর সাথে চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং পৌরসভার হাতেই পুরানো দামে জল সরবরাহের দায়িত্ব পুনরায় অর্পণ করা হয়। এই ঘটনা বলিভিয়ার জলযুদ্ধ নামে পরিচিত।

তুমি কি বলছ ধর্মঘট, ধর্ণা, হরতাল এবং প্রতিবাদ আন্দোলন গণতন্ত্রের জন্য ভালো?

## গণতন্ত্র এবং গণআন্দোলন (Democracy and Popular Struggles) :

এই দুটি ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সংগঠিত হয়েছে। নেপালের আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য, আর বলিভিয়ার আন্দোলন ছিল নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের থেকে মানুষের অধিকার আদায়ের নিমিত্তে। বলিভিয়ার গণআন্দোলন ছিল সরকারের একটি বিশেষ নীতি সম্পর্কিত, আর নেপালে সংগঠিত আন্দোলন ছিল দেশের রাজনীতির মৌলিক ভিত্তি সম্পর্কিত। দুটো আন্দোলনই সফল ছিল এবং তাদের প্রভাব ছিল দুটি ভিন্ন স্তরে।

উল্লেখিত দুটি আন্দোলনের প্রকৃতি ও প্রভাব ভিন্ন হলেও উভয় ঘটনার মধ্যেই কিছু সর্বজনীন উপকরণ নিহিত আছে, যা গণতন্ত্রের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই দুটি ঘটনাই কীভাবে রাজনৈতিক বিবাদ গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উভয় ক্ষেত্রেই আন্দোলন গণচেতনায় পর্যবসিত হয়েছে। জনসমর্থিত যেকোনো গণবিক্ষোভ বিবাদ মেটাতে সক্ষম। সর্বশেষ দুটো উদাহরণই রাজনৈতিক সংগঠনের বিশাল ভূমিকার কথা ব্যক্ত করে। তুমি যদি নবম শ্রেণির পাঠ্য বই-এর প্রথম অধ্যায়টির কথা স্মরণ কর তাহলে দেখবে এভাবেই পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্র বিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এই উদাহরণগুলো থেকে আমরা কিছু উপসংহার টানতে পারি।

- গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের বিবর্তন ঘটে। সহমতের ভিত্তিতে তথা সংঘাত ছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব, এটা হল ব্যতিক্রম। তবে গণতন্ত্রের বিবর্তনের পথে উল্লেখযোগ্য প্রতিটি মুহূর্তই ছিল সংঘাতময়। এই সংঘাত সংগঠিত হয় ক্ষমতাবান শাসক ও ক্ষমতা প্রত্যাশী গোষ্ঠীর মধ্যে। এসকল সংঘাতময় উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত তখনই আসে যখন কোনো দেশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, রূপান্তরের পথে হাঁটে। এই অবস্থা গণতন্ত্রের

প্রসার, গভীরভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

- গণতান্ত্রিক সংঘাত গণচেতনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। কখনো কখনো এই ধরনের সংঘাত চলমান আইন কিংবা বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারাও সমাপ্ত হয়। কিন্তু সংঘাত যখন গভীর হয়, তখন সংসদ কিংবা আদালতের মত প্রতিষ্ঠানগুলোও এতে জড়িয়ে পরে। এই অবস্থায় সমাধান আসতে হয় বাইরে থেকে বা জনগণ থেকে।

- এধরনের সংঘাত এবং গণচেতনার ভিত্তি হল নতুন রাজনৈতিক সংগঠন। যদিও একথা সত্য যে, প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ঘটনায় স্বত:স্ফুর্ত উপকরণ নিহিত থাকে। কিন্তু স্বত:স্ফুর্ত গণ অংশগ্রহণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের সাহায্যেই ফলপ্রসু হয়। সংগঠিত রাজনীতির অনেক সংস্থাই থাকতে পারে। এরমধ্যে অন্যতম হল রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টি ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠী।

এর অর্থ কি এই যে, যখনি কোনো দল বিশাল সংখ্যায় গণসমাবেশ সংগঠিত করতে পারে তখন নিজেরাই তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে? আমরা কি তাহলে বলছি 'জোর যার মুল্লুক তার'। — প্রবাদটি গণতন্ত্রের বেলায়ও ঘটে?

১৯৮৪ সালে কর্ণাটক সরকার কর্ণাটক পাল্পউড লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। ৪০ বছরের জন্য প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর জমি এই কোম্পানিকে বিনামূল্যে প্রদান করে। জমিগুলোর বেশিরভাগই স্থানীয় কৃষকরা তাদের গবাদিপশুর চারণভূমি হিসাবে ব্যবহার করত। যাইহোক কোম্পানি সেখানে ইউক্যালিপ্টাস গাছের চারা রোপণ করে, যার দ্বারা পাল্পনামক কাগজ তৈরি করা হয়। ১৯৮৭ সালে কিট্টিকো-হাচ্ছিকো (এর অর্থ হল উপড়ে ফেল ও রোপণ কর) নামক একটি অহিংস আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের অংশ হিসাবে জনগণ ইউক্যালিপ্টাস গাছের চারাগুলো উপড়ে ফেলে এবং সেখানে তাদের জন্য উপকারী গাছের চারা রোপণ করে।

তুমি যদি নীচের বর্ণিত যে কোনো একটি গোষ্ঠীর সদস্য হও তাহলে নিজের সপক্ষে তুমি কী যুক্তি তুলে ধরবে : একজন স্থানীয় কৃষক, একজন পরিবেশ কর্মী, একজন সরকারি আধিকারিক যে এই কোম্পানিতে কর্মরত অথবা পাল্প কাগজের একজন গ্রাহক বা ভোক্তা।

## গণসমাবেশ ও সংগঠন (Mobilisation and Organisations)

চলো পূর্বে উল্লেখিত দুটি ঘটনার দিকে ফিরে যাই এবং দেখি কীভাবে কোনো সংগঠন এই গণআন্দোলনগুলোকে সফল করতে সাহায্য করেছে। আমরা উল্লেখ করেছি যে, সাতটি দলের একটি জোট নেপালে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করে। এই জোটে এমন কিছু রাজনৈতিকদল অন্তর্ভুক্ত ছিল পার্লামেন্টে যাদের প্রতিনিধিত্ব আছে। নেপালের এই গণবিক্ষোভের পেছনে শুধুমাত্র সাত দলের জোটই ছিল না বরং নেপালের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, যারা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনা তারাও এই প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। এই দলটি মূলত নেপালের সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিল এবং এরা নেপালের বিশাল জায়গা জুড়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

রাজনৈতিক দল ছাড়া অন্যান্য সংগঠনও এই আন্দোলনে যুক্ত ছিল। সকল প্রকার শ্রমিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশন এতে অংশ গ্রহণ করে। তাছাড়া সেখানকার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী, শিক্ষক, আইনজীবি এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীর লোকেরাও এই আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে।

মোবিলাইজেশন শব্দটি আমার পছন্দ নয়, এতে এমন অনুভূতি হয় যে মানুষ যেন ভেড়ার মত।

বলিভিয়ায় জল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা প্রতিবাদ আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত হয়নি। যে সংগঠন দ্বারা এই আন্দোলন পরিচালিত হয় তাকে বলা হত ফেডিকোর (FEDECOR)। এই সংগঠনটিতে স্থানীয় পেশাদার যেমন- ইঞ্জিনিয়ার ও পরিবেশবাদীরা যুক্ত ছিলেন। তাদেরকে সমর্থনকারী সংগঠনগুলো যেমন ফেডারেশন অব্ ফার্মার যারা সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল, দ্যা কনফেডারেশন অব্ ফ্যাক্টরি ওয়ারকার্স ইউনিয়ন, কোচাবাম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বিদ্যার্থীগণ এবং শহরের ক্রমবর্ধমান গৃহহীন পথশিশু। দেশের সমাজতান্ত্রিক দলও এই আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে । ২০০৬ সালে এই দলটিই বলিভিয়ায় শাসন ক্ষমতা লাভ করে।

দুটি উদাহরণ থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে কোনো বৃহৎ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বা গণআন্দোলনের পেছনে বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে থাকে। এই সংগঠনগুলো দুইভাবে তাদের ভূমিকা রাখে। প্রথমটি হল প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা। এটি করা হয় রাজনৈতিক দল সৃষ্টি, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সরকার গঠন করা ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় প্রতিটি জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে না। তাদের হয়তো ইচ্ছাও নেই, প্রয়োজন নেই অথবা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের দক্ষতা নেই। একমাত্র ভোট প্রদানকে তারা রাজনৈতিক দায়িত্ব মনে করে।

এছাড়া অনেক বিকল্প পথও রয়েছে যার মধ্যে জনগণ সরকারকে তাদের দাবীর কথা অথবা মতামত শুনতে বাধ্য করে। কোনো সংগঠন গড়ে তোলা, তাদের স্বার্থও মতামতের সপক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার মাধ্যমে জনগণ এটা করতে পারে। এদেরকে বলা হয় স্বার্থান্বেষী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। কখনো কখনো জনগণ কোনো সংগঠন ছাড়াই সহমতের ভিত্তিতে একসাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

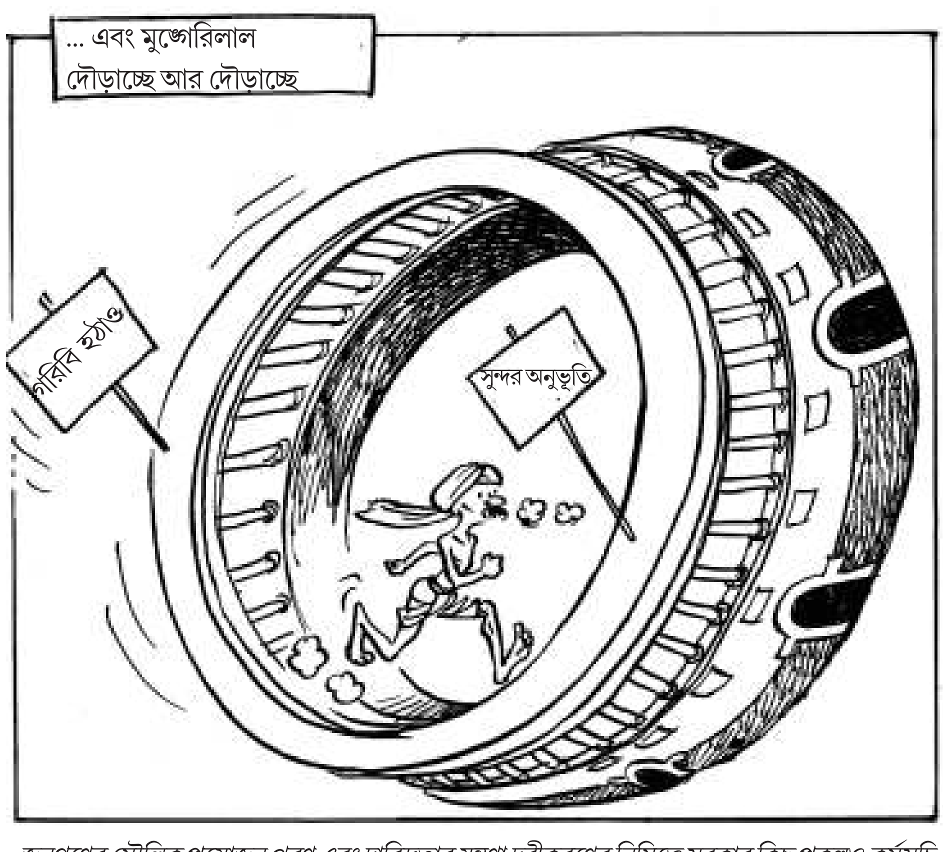


*জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং দারিদ্রতার যন্ত্রণা দূরীকরণের নিমিত্তে সরকার কিছু প্রকল্পও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কিন্তু দেশে এখনো দারিদ্রতা বর্তমান। এই অবস্থার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে?*

## চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও আন্দোলন
## (Pressure groups and movements)

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন কিছু সংস্থা যারা সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের মত তারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে না কিংবা নিয়ন্ত্রণ করে না। সমপেশা, সমস্বার্থ, সমআকাঙ্খা অথবা সমমতের অধিকারী জনগণ যখন বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য অর্জনে একসাথে মিলিত হয়ে কোনো সংগঠন তৈরি করে তখনি তা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

উপরের আলোচনাকালে আমরা এমন কতগুলো অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছি তাদেরকে ঠিক সংগঠন বলা যায় না। নেপালে ঘটে যাওয়া সংগ্রামকে গণতন্ত্রের প্রতিবাদ আন্দোলন বলা হয়। যেকোনো সমবেত কর্মসূচিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমরা গণআন্দোলন কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করি। যেমন- নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, তথ্য জানার অধিকার আন্দোলন, নেশা বিরোধী আন্দোলন, নারী আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন ইত্যাদি। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মত একটি নির্দিষ্ট আন্দোলনও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা। তবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিপরীতে আন্দোলনগুলোর সংগঠন ঢিলেঢালা হয়। তাদের সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়া অধিক আনুষ্ঠানিক এবং যথেষ্ট নমনীয়। তারা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর চেয়েও জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের উপর বেশি নির্ভরশীল।

*তোমরা কি এখানে প্রদত্ত টুকরো খবরের কাগজগুলোতে সক্রিয় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করতে পার? তারা কি দাবি করছে?*

*ভূমি অধিকার আন্দোলন :২০০৪ সালের জুন মাসে পশ্চিম জাভার প্রায় ১৫,০০০ ভূমিহীন কৃষক ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে উপস্থিত হয়েছে। পরিবারের সদস্য সহ তারা এখানে ভূমি সংস্কারের দাবি নিয়ে এসেছে। যাতে তারা তাদের কৃষিজমি ফিরে পায়। আন্দোলন কর্মীদের স্লোগান ছিল 'জমি নাই তো ভোট নাই', পাশাপাশি তারা ঘোষণা করে যে যদি তাদের দাবির সমর্থনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না এগিয়ে আসে তাহলে তারা ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বয়কট করবে।*

## সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও জনস্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Sectional interest groups and public interest groups) :

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো সাধারণত সমাজের নির্দিষ্ট কোনো দল বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষার চেষ্টা করে। বিভিন্ন ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী সমিতি এবং পেশাদারি সংস্থা যেমন-আইনজীবি, চিকিৎসক, শিক্ষক কর্মচারী ইত্যাদি। এরা সংকীর্ণ, কারণ তারা সমাজের একটিমাত্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন শ্রমিক, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ধর্মানুসারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ইত্যাদি। তাদের মূল উদ্দেশ্য হল নিজ সদস্যদের কল্যাণে কাজ করা, সমাজের সকলের জন্য নয়।

কখনো কখনো এই সংগঠনগুলো সমাজের নির্দিষ্ট একটি অংশের স্বার্থকেই প্রতিনিধিত্ব করে এমনটা নয়। তারা কিছু সাধারণ কিংবা সার্বজনীন স্বার্থের সপক্ষেও দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সফলতায় সংগঠনের নিজ সদস্যদের হয়তো কোনো লাভ থাকে না। এধরনের সংগঠনের অন্যতম উদাহরণ হল বলিভিয়ার ফিডিকোর নামক সংগঠনটি। নেপালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কথা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। নবম শ্রেণিতে আমরা এসকল সংগঠনের কথা অধ্যয়ন করেছি।

দ্বিতীয় প্রকার দলগুলো হল জনস্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা প্রচারকারী গোষ্ঠী। তারা সংকীর্ণ স্বার্থের বিপরীতে সামগ্রিক স্বার্থের কথা তুলে ধরে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হল নিজ সদস্যদের স্বার্থের বাইরে গিয়ে অন্যগোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা করা। উদাহরণস্বরূপ চুক্তিবন্ধ শ্রম প্রথার বিরুদ্ধে কোনো একটি সংগঠন যখন সংগ্রাম করে তখন তা নিজ স্বার্থে হয় না। বরং তাদের স্বার্থে পরিচালিত হয় যারা এই দাসত্বের নিপীড়ন দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করে আসছে। আবার কিছু উদাহরণে এটাও দেখা যায় যে জনস্বার্থান্বেষী কোনো গোষ্ঠী যখন জনস্বার্থে কোনো কর্মসূচি হাতে নেয় তখন এর থেকে অন্যদের পাশাপাশি নিজেরাও লাভবান হয়। উদাহরণস্বরূপ বি এ এম সি ই এফ (Backward and Minority Communities Employees Federation) হল বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সৃষ্ট একটি সংগঠন, যারা জাতি

ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই সংগঠনটি নিজের ঐ সকল সদস্যদের সমস্যার কথাও তুলে ধরেন যারা বৈষম্যের শিকার। কিন্তু তাদের প্রধান কর্মসূচিগুলো যুক্ত থাকে সমাজে সামগ্রিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

**আন্দোলন গোষ্ঠী (Movement groups) :** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মত এই গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন প্রকারের আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকে। উপরে উল্লেখিত উদাহরণগুলো ইতিমধ্যেই এদের মধ্যকার সাধারণ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। বেশিরভাগ আন্দোলনই নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক সংগঠিত হয়, যা তারা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে অর্জন করার চেষ্টা করে। অন্য আন্দোলনগুলো অনেকটাই প্রথাগত আন্দোলন বা জাতিগত আন্দোলন। যা তারা একটি বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘসময় ধরে করে থাকে।

গণতন্ত্রের জন্য নেপালের আন্দোলন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়। আর এই উদ্দেশ্যটি ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজার নির্দেশিকা পাল্টে দেওয়া। ভারতে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন এমনই একটি ভালো উদাহরণ। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল নর্মদা নদীর উপরে সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের ফলে বাস্তুচ্যুত জনগণের সমস্যা নিয়ে। এর উদ্দেশ্য ছিল বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করা। ক্রমে ক্রমে এটি বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত হয়, যা এই ধরনের সকল বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পকে প্রশ্নের সম্মুখে ঠেলে দেয়। এই আন্দোলন ঐ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন তোলা শুরু করে, যেখানে বাঁধ নির্মাণ অপরিহার্য। এরূপ আন্দোলন কিছু সংগঠন এবং স্বচ্ছ নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে। তবে এদের মেয়াদকাল সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়।

এরূপ একক ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের বিপরীতে এমন আন্দোলনও আমরা লক্ষ্য করি, যারা দীর্ঘ মেয়াদি ও বহু বিষয় ভিত্তিক। পরিবেশ আন্দোলন ও নারী আন্দোলন এর প্রকৃত উদাহরণ। এধরনের আন্দোলন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি সংগঠনই কাজ করে না, বিশাল সংখ্যক সংগঠন এবং বিষয় ভিত্তিক আন্দোলনের জন্য পরিবেশ আন্দোলন দায়বদ্ধ থাকে। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সংগঠন, স্বাধীন নেতৃত্ব এবং নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ভিন্ন মত থাকে। যদিও এদের

সামাজিক আন্দোলন ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমূহ বিভিন্ন ভাবে গণচেতনা বৃদ্ধি ও সমাবেশ করার চেষ্টা করে। নীচের কোলাজ তার কিছু প্রদর্শন করছে।

© Surendra - *The Hindu*

অনেক গণতান্ত্রিক সরকার নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার (RTI) প্রদান করেছে। ২০০৫ সালে আমাদের সংসদ দ্বারা প্রণীত তথ্য অধিকার আইন এক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। এই আইনের আওতায় জনগণ সরকারি দপ্তরে যেকোনো কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য জানতে চাইতে পারে। তুমি কি মনে কর ব্যঙ্গাচিত্রটি এই আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বিরোধের বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে চিত্রায়িত করেছে?

সকলের একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য ও সমদৃষ্টিভঙ্গী থাকে। একারণেই এদেরকে আন্দোলন বলা হয়। কখনো কখনো এসকল সংগঠনের একটি ঢিলেঢালা পৃষ্ঠপোষক সংগঠন থাকে। উদাহরণস্বরূপ ন্যাশনাল এলায়েন্স ফর পিপলস্ মুভমেন্ট (NAPM) হল আন্দোলন সমূহের একটি মিলিত সংগঠন। বিভিন্ন আন্দোলন গোষ্ঠী যারা সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সংগ্রাম করে তারাই এই বৃহৎ সংগঠনের অংশীদার। এই পৃষ্ঠপোষক সংগঠনটি দেশের বিভিন্ন গণআন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

কীভাবে তারা রাজনীতিকে প্রভাবিত করে?

চাপসৃষ্টি ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠী সমূহ বিভিন্ন উপায়ে রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

- বিভিন্ন সভা সমিতির আয়োজন, সরকারি দপ্তরে আবেদনলিপি প্রদান, তথ্য সম্বলিত প্রচারাভিযান ইত্যাদির মাধ্যমে এই সংগঠনগুলো তাদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর প্রতি জনসমর্থন ও সহানুভূতি অর্জন করার চেষ্টা করে। এদের বেশিরভাগই আন্দোলন ইস্যুগুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করানোর জন্য গণমাধ্যমকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

*সংবাদপত্রের এই কাটা অংশগুলোতে কোন কোন সামাজিক আন্দোলন তালিকাভুক্ত হয়েছে? তারা কি ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে? সমাজের কোন্ অংশকে তারা সচেতন করার চেষ্টা করেছে?*

● এরা প্রায়ই সরকারি কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা ধর্মঘটের মত প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করে। শ্রমিক সংগঠন, বিভিন্ন কর্মচারী সমিতি ও আন্দোলনগোষ্ঠী এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করে সরকারকে তাদের দাবী পূরণে বাধ্য করে।

● ব্যবসায়িক সম্প্রদায়গুলো এক্ষেত্রে প্রায়ই পেশাদারি লবি নিযুক্ত করে। অথবা ব্যয়বহুল বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপণ প্রচারে অর্থ প্রদান করে। চাপসৃষ্টিকারী ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর কোনো কোনো সদস্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কমিটিতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সরকারকে নানাহ পরামর্শ প্রদান করে।

যদিও স্বার্থান্বেষী ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠী দলীয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না, তবে রাজনৈতিক দলের উপর তারা সবসময়ই প্রভাব বিস্তারের চেস্টা করে। রাজনৈতিক দল না হয়েও বেশিরভাগ আন্দোলনকারী গোষ্ঠী বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন রূপের হয়, কখনো তা প্রত্যক্ষ আবার কখনো খুব বেশি অপ্রত্যক্ষ।

● কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের দ্বারাই সৃষ্টি কিংবা পরিচালিত হয়। অথবা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের বর্ধিত বাহু হিসাবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের বেশিরভাগ ছাত্র সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলো হয় এক বা একাধিক রাজনৈতিক দলের দ্বারা সৃষ্টি কিংবা তাদের দ্বারা অনুমোদিত। এধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর বেশিরভাগ নেতৃত্ব সাধারণত কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা কিংবা সক্রিয় কর্মী।

● কখনো কখনো গণআন্দোলনের মধ্য থেকেই রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ- যখন আসামে ছাত্রদের নেতৃত্বে 'বিদেশিদের' বিরুদ্ধে গড়ে উঠা আন্দোলন সমাপ্ত হয় তখন এর থেকে জন্ম নেয় অসম গণপরিষদ। তামিলনাড়ুর ডি এম কে এবং এ আই এ ডি এম কে-র যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকে। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে চলমান সামাজিক সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে।

● বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল চাপসৃষ্টিকারী ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্ক খুব বেশি সরাসরি হয় না। তারা কখনো একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহন করে, যদিও তারা আলাপ-আলোচনায় ও মত বিনিময়ে লিপ্ত থাকে। আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর দ্বারা উত্থাপিত নতুন বিষয়গুলো রাজনৈতিক দল লুফে নেয়। রাজনৈতিক দলের নতুন নেতৃত্ব স্বার্থান্বেষী ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠী থেকেই উঠে আসে।

## তাদের প্রভাব কি স্বাস্থ্যকর ? (Is their influence healthy?)

প্রাথমিকভাবে এটা মনে হতে পারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারের জন্য একটি মাত্র অংশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করা চাপসৃষ্টি বা আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর জন্য মোটেই সমীচীন নয়। গণতন্ত্র একটি মাত্র অংশের নয় বরং সকলের স্বার্থকেই সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে লক্ষ্য রাখবে। আবার এটাও মনে হতে পারে যে, এই গোষ্ঠীগুলো কর্তব্য পালন ছাড়াই শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নির্বাচন পর্বে সকল রাজনৈতিক দলকেই জনগণের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলো কখনোই জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ নয়। চাপসৃষ্টি ও আন্দোলনকারী

এক সপ্তাহ ধরে সংবাদ পরিবেশনকারী চ্যানেলগুলোকে অনুসরণ কর। নিম্নে বর্ণিত গোষ্ঠীগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন চাপসৃষ্টি ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠীগুলোর সাথে সম্পর্কিত সংবাদগুলোকে নিয়ে মন্তব্য কর: কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, শিল্প, পরিবেশ এবং নারী। এদের মধ্যে কোন অংশকে নিয়ে দূরদর্শন সংবাদে বেশি আলোচিত হয়? এদের মধ্যে কোন অংশকে নিয়ে সবচেয়ে কম আলোচনা হয়? ঘরে টেলিভিশন না থাকলে তুমি সংবাদপত্রও অনুসরণ করতে পার।

*গ্রিন বেল্ট মুভমেন্ট নামক একটি সংগঠন সমগ্র কেনিয়ায় ৩০ মিলিয়ন গাছের চারা রোপণ করেছে। এই সংগঠনটির নেত্রী ওয়াংগিরি মাথাই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সরকারি আধিকারিকদের প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত হতাশ হয়েছেন।*

'১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশকে আমি যখন কৃষকদেরকে তাদের নিজ জমিতে গাছের চারা রোপণের জন্য উৎসাহিত করছিলাম, তখনি আমি আবিষ্কার করি যে, বিত্তশালী শিল্পপতি কিংবা উন্নয়ন নির্মাতাদের নিকট অবৈধভাবে গাছ এবং ভূমি বিক্রির পেছনে মূল অভিযুক্তরা হল দুর্নীতিগ্রস্ত বিভিন্ন সরকারি সংস্থা। ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে রাষ্ট্রপতি দ্যানিয়েল আর্প ময় সরকারের অনুগামীরা যখন বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করে তখন কেনিয়ার রিফ্ট উপত্যকার প্রচুর মানুষের জীবন, জীবিকা ও অধিকার ধ্বংস হয়। এর ফলে শাসক দলের অনুগামীরাই জমির মালিক হল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুগামীরা বাস্তুচ্যুত হল। শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এটাই ছিল সরকারের কৌশল। কারণ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যখন ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে তখন গণতন্ত্র নিয়ে দাবী করার সুযোগ তারা অনেক কম পাবে।

*উপরের স্তবকটিতে গণতন্ত্র ও সামাজিক আন্দোলনের মাঝে তুমি কী ধরনের সম্পর্ক লক্ষ্য কর? আন্দোলনকারী এই সংগঠনটির সরকারের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া কীভাবে ব্যক্ত করা উচিত?*

গোষ্ঠীগুলো জনগণ থেকে সমর্থন কিংবা অর্থনৈতিক সাহায্য নাও পেতে পারে। কখনো কখনো প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সামান্য জনসমর্থন নিয়েও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো জনমতকে তাদের সংকীর্ণ স্বার্থের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে।

তবে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে চাপসৃষ্টি ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠীগুলো গণতন্ত্রকে গভীরতর করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক দলের উপর চাপসৃষ্টি করা কোনো অহেতুক কাজ নয়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সমাজের প্রত্যেকেই যেন এই সুযোগ ভোগ করতে পারে। কখনো কখনো সরকার আকারে ছোটো অথচ বিত্তশালী ও ধনী লোকেদের দ্বারা অযৌক্তিক চাপের শিকার হয়। জনস্বার্থবাদী ও আন্দোলন গোষ্ঠীগুলো এই ধরনের অযৌক্তিক প্রভাবের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি সরকারকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও তাদের সাথে যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এমনকি সংকীর্ণ স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলোও মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেখানে বিভিন্ন দল সক্রিয়ভাবে কাজ করে, তখন সমাজে কোনো একটি নির্দিষ্ট দল প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। যদি একটি দল তার নিজের স্বার্থে আইন প্রণয়নে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাহলে অন্য একটি দলও নিজেদের স্বপক্ষে নীতি প্রণয়নের জন্য সরকারের উপর অনুরূপ চাপ সৃষ্টি করবে। জনগণের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন দাবী সম্পর্কিত কথা সরকারকে শুনতে হয়। এভাবেই পরস্পর বিরোধী স্বার্থগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হয়।

*এই ব্যঙ্গাচিত্রটিকে বলা হয় 'খবর এবং বেখবর'। (News and no News) গণমাধ্যমকে বেশি দৃশ্যমান? সংবাদ মাধ্যমে কার সম্পর্কে আমরা বেশি শুনতে চাই?*

## অনুশীলনী

১)	কীভাবে চাপসৃষ্টি ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠী সমূহ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে?

২)	রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ নিয়ে ব্যাখ্যা কর।

৩)	কীভাবে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মসূচি গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যকারিতায় উপযোগী হয়?

৪)	চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৫)	একটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্য কী?

৬)	যে সকল সংগঠন সমাজের নির্দিষ্ট অংশ, যেমন- শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষাকর্মী এবং আইনজীবী ইত্যাদির স্বার্থ সমুন্নত রাখার জন্য কাজ করে তাদেরকে বলা হয় ——————— গোষ্ঠী।

৭)	নীচের কোন্ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দল থেকে পৃথক করে?

ক)	রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহন করে, তবে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথায় ঘামায় না।

খ)	চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কিছু লোকের মধ্যেই সীমিত, তবে রাজনৈতিক দলের লোকসংখ্যা প্রচুর।

গ)	চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা লাভের চেস্টা করে না, তবে রাজনৈতিক দল তা লাভ করতে চায়।

ঘ)	চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী জনসমাবেশ করে না, তবে রাজনৈতিক দল করে।

৮)	প্রথম তালিকাটিকে (সংগঠন এবং সংগ্রাম) দ্বিতীয় তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখ এবং প্রদত্ত কোডের সাহায্যে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর।

| | প্রথম তালিকা | দ্বিতীয় তালিকা |
|---|---|---|
| ১ | যে সকল সংগঠন সমাজের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বা অংশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে চায়। | (ক) আন্দোলন। |
| ২ | যে সকল সংগঠন জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ সমুন্নত রাখে। | (খ) রাজনৈতিক দল। |
| ৩ | কোনো প্রকার সাংগঠনিক কাঠামো ছাড়াই সামাজিক সমস্যা সমাধানে উত্থিত আন্দোলন। | (গ) আংশিক স্বার্থান্বেষী। |
| ৪ | রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল সংগঠন জনসমাবেশ করে। | (ঘ) জনস্বার্থবাদী গোষ্ঠী। |

| | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|---|
| অ | গ | ঘ | খ | ক |
| আ | গ | ঘ | ক | খ |
| ই | ঘ | গ | খ | ক |
| ঈ | খ | গ | ঘ | ক |

৯) প্রথম তালিকাটিকে দ্বিতীয় তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখ। নিম্নে প্রদত্ত কোডের সাহায্যে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর।

| | প্রথম তালিকা | দ্বিতীয় তালিকা |
|---|---|---|
| ১ | চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। | ক) নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। |
| ২ | দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন। | খ) অসম গণপরিষদ। |
| ৩ | একক ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন। | গ) নারী আন্দোলন। |
| ৪ | রাজনৈতিক দল। | ঘ) সার ব্যবসায়ী সমিতি। |

| | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|---|
| অ | ঘ | গ | ক | খ |
| আ | খ | ক | ঘ | গ |
| ই | গ | ঘ | খ | ক |
| ঈ | খ | ঘ | গ | ক |

১০) নীচে প্রদত্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত মন্তব্যগুলোকে বিবেচনা কর।

ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থ ও মতামতের সংগঠিত অভিব্যক্তির বহি:প্রকাশ।

খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমূহ রাজনৈতিক বিষয়ে অবস্থান গ্রহন করে।

গ) সকল রাজনৈতিক গোষ্ঠীই রাজনৈতিক দল।

উল্লেখিত কোন বক্তব্যটি বা মন্তব্যগুলো সঠিক?

অ) ক,খ এবং গ (আ) ক এবং খ (ই) খ এবং গ (ঈ) ক এবং গ।

১১) মেওয়াত হল হরিয়ানা রাজ্যের সবচেয়ে পিছিয়েপড়া একটি এলাকা। এই এলাকাটি গুরগাঁও এবং ফরিদাবাদ উভয় জেলারই অংশ। জনগণ মনে করত যে মেওয়াত যদি একটি পৃথক জেলায় পরিণত হয় তাহলে এলাকাটি সকলের বিশেষ নজরে আসবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো এধরনের আবেগের প্রতি উদাসীন ছিল। মেওয়াত এডুকেশনাল এণ্ড সোসাল অরগানাইজেশন ও মেওয়াত স্বাক্ষরতা সমিতি নামক দুটি সংগঠন ১৯৯৬ সালে মেওয়াতকে পৃথক জেলা ঘোষণার দাবী উথাপন করে। পরবর্তীতে ২০০০ সালে মেওয়াত বিকাশ সভা গঠিত হয়। এই সংগঠনটি উক্ত দাবীর স্বপক্ষে ক্রমাগত জনসচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালিয়ে যায়। এর ফলে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল নামক দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল এই নতুন জেলা গঠনের দাবীর প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। এভাবে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে একটি নতুন জেলা আত্মপ্রকাশ করে।

এই উদাহরণটিতে তুমি সরকার, রাজনৈতিক দল এবং আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক লক্ষ করেছ? তুমি কি এমন একটি উদাহরণের কথা বলতে পার যা উল্লেখিত সম্পর্কের বাইরে ভিন্ন কোনো সম্পর্ককে প্রদর্শন করে?

# রাজনৈতিক দল (Political Parties)

অধ্যায় ৬

## সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Overview)

গণতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনার এই পরিক্রমায় আমরা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কথা বলেছি। নবম শ্রেণিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কিভাবে রাজনৈতিক দল সমূহ গণতন্ত্রের উত্থান, সাংবিধানিক রূপরেখা প্রণয়ন, নির্বাচনি রাজনীতি, সরকার গঠন, সরকার পরিচালন ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পাঠ্যবইয়ে আমরা রাজনৈতিক দল সমূহকে রাজনৈতিক ক্ষমতার যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্বের বাহন ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির অঙ্গনে সামাজিক বৈচিত্র্যতার মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দেখার চেষ্টা করেছি। এই পরিক্রমার সমাপ্তির পূর্বে, চলো আমরা রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও পরিচালন কেমন তা খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করি। বিশেষ করে ভারতের প্রেক্ষাপটেও আমরা তা লক্ষ করব। দুটি সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে আমরা এই আলোচনা শুরু করতে পারি ঃ রাজনৈতিক দল কেন আমাদের জন্য প্রয়োজন? কত সংখ্যক দল গণতন্ত্রের জন্য উত্তম? এই দুটি প্রশ্নের আলোকে আমরা বর্তমান ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলোকে নিয়ে কথা বলব পাশাপাশি আমরা এই রাজনৈতিক দলগুলোর সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কেও আলোচনা করব।

## রাজনৈতিক দল আমাদের কেন প্রয়োজন ? (Why do we need political parties?)

সুতরাং, তুমি আমার সাথে একমত যে, রাজনৈতিক দলগুলা পক্ষপাতপূর্ণ ও ভেদাভেদকারী এবং সবসময়ই বিভাজনের দিকে ধাবিত করে। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে বিভাজন ছাড়া আর কিছুই করে না। এটাই তাদের আসল কাজ।

রাজনৈতিক দল হল গণতন্ত্রের অন্যতম সহজে দৃশ্যমান একটি প্রতিষ্ঠান। সাধারণ নাগরিকের কাছে গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দল সমার্থবোধক। তুমি যদি আমাদের দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো ঘুরে ঘুরে কম শিক্ষিত মানুষদের সাথে কথা বলো, তাহলে দেখতে পাবে তারা হয়ত আমাদের দেশের সংবিধান কিংবা সরকারের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু সম্ভবত তারা আমাদের রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কিছু না কিছু জানে। পাশাপাশি এই দৃশ্যমান অবস্থার অর্থ এই নয় যে রাজনৈতিক দলগুলো খুব জনপ্রিয়। অনেক মানুষ এমনও আছে যারা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচণ্ড সমালোচনা করে। এরা আমাদের রাজনৈতিক জীবন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সকল সমস্যার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়ী করে থাকে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের সাথে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

সুতরাং এই প্রশ্ন করা খুবই স্বাভাবিক যে আসলেই কি আমাদের রাজনৈতিক দল প্রয়োজন ? আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে পৃথিবীর সামান্য কিছু দেশে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি ছিল। বর্তমানে কয়েকটি মাত্র দেশ আছে যেখানে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি নেই। সমগ্র পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সর্বত্রই রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি কেন ? এই প্রশ্নের মূল উত্তর খুঁজে পাবার আগে চলো আমরা জানার চেষ্টা করি রাজনৈতিক দল কারা এবং কি তাদের কাজ।

### রাজনৈতিক দলের অর্থ (Meaning)

রাজনৈতিক দল এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা এক সাথে মিলিত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং সরকার প্রণয়নে ক্ষমতা হস্তগত করে। তারা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রণীত পরিকল্পনা ও প্রকল্প সমূহকে সমর্থন করে। যদিও সামগ্রিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে বিভিন্ন মত থাকে। তবুও রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করে যে কেন তাদের প্রণীত নীতিমালা অন্যদের তুলনায় ভালো,

(১)

(২)

(৩)

(৪)

© (1) M Govarthan (2) A Muralidharan (3) M Moorthy (4) T Singaravelou, *The Hindu*

নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময়কালে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা যে কোন প্রকারের দেওয়াল লিখনের উপর সরকারিভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। অনেক রাজনৈতিক দল মনে করে যে, দেওয়াল লিখন ছিল প্রচারের সহজ ও সস্তা পদ্ধতি। নির্বাচন সময়কালে অনেক অদ্ভুত ও মজার দেওয়াল লেখনীগুলো লক্ষ করার মতো। এখানে তামিলনাড়ুর কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

© RK Laxman - *Brushing up the years*

নির্বাচনের ভিত্তিতে জনগণের সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রণীত নীতি ও পরিকল্পনা সমূহকে রূপায়ন করতে সচেস্ট হয়।

তবে, রাজনৈতিক দলের মধ্যে দিয়েই সমাজে রাজনৈতিক বিভাজন বিকশিত হয়। রাজনৈতিক দল যেহেতু সমাজের একটি অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে তাই পক্ষপাত তাদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। একটি রাজনৈতিক দলের পরিচিতি নির্ভর করে, সমাজের কোন অংশকে সে প্রতিনিধিত্ব করে, কোন ধরনের নীতিমালা সে সমর্থন করে, কাদের স্বার্থ সে রক্ষা করে ইত্যাদির উপর। একটি রাজনৈতিক দলের তিনটি উপকরণ থাকে।

- নেতৃবৃন্দ
- সক্রিয় কর্মী এবং
- অনুগামী বা সমর্থক

## রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions)

একটি রাজনৈতিক দলের কাজ কি? মূলতঃ রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতা অনুশীলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যালয় ও তার পদগুলো পূর্ণ করে। কতগুলো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো এটা করে থাকে।

১ রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচনি যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দলগুলো বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের প্রার্থী মনোনীত করে। যুক্তরাজ্যের মত কিছু দেশে দলের সদস্য এবং সমর্থকরা মিলে তাদের প্রার্থী নির্বাচন করে। বর্তমানে অনেক রাষ্ট্র এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ভারতের মতো দেশে দলের সর্বোচ্চ নেতারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাদের প্রার্থী মনোনীত করেন।

২ রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন নীতিমালা ও প্রকল্প সুপারিশ করে, যার মধ্যে থেকে ভোটারগণ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে পছন্দ করে নেয়। সমাজের জন্য কোন্ নীতিমালাগুলো প্রযোজ্য সে ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মত থাকতে পারে। কিন্তু কোনো সরকারের পক্ষেই এই বিশাল সংখ্যক প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রে এই বিশাল সংখ্যক সাযুজ্যপূর্ণ প্রত্যাশাগুলোকে এক সাথে সমন্বয় করে নিতে হয় এবং এর দিক নির্দেশনা অনুসারে সরকারকে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলো এই সমন্বয়ের কাজটিই করে। একটি রাজনৈতিক দল বিশাল সংখ্যক মতামতকে তাদের সমর্থিত

### টিকা

পক্ষপাতপূর্ণ ঃ এমন এক ব্যক্তি যা কোনো দল, গোষ্ঠী কিংবা কর্তব্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পক্ষপাতপূর্ণতা এমন এক মানসিকতার দ্বারা আবদ্ধ যা কোনো একটি নির্দিষ্ট পক্ষ অবলম্বন করে। তবে কোনো বিষয়ে ভারসাম্যমূলক অবস্থান নিতে অসমর্থ।

কয়েকটি অবস্থানের মধ্যে সীমিত করে দেয়। সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের মতামত কিংবা অবস্থান অনুসারে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করে।

৩ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নে রাজনৈতিক দলগুলোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। সাধারণত আইন সভাতেই প্রস্তাবিত আইন নিয়ে বিতর্ক হয় ও পাশ হয়। যেহেতু আইনসভার বেশিরভাগ সদস্য নির্দিষ্ট একটি দলের সভ্য তাই তারা ভিন্ন ভিন্ন মতামতের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে।

৪ রাজনৈতিক দল সরকার গঠন ও পরিচালনা করে। বিগত বছরে আমরা উল্লেখ করেছি যে রাজনৈতিক দলের কার্যনির্বাহী ব্যক্তিগণই বড় বড় নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো নেতা নির্বাচন করে, তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে মন্ত্রীত্ব প্রদান করে যাতে তারা সরকারের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করে।

৫ নির্বাচনে পরাজিত অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ রাজনৈতিক দলগুলো সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সমাজের বিভিন্ন দাবি দাওয়া কিংবা মতামতগুলো তুলে ধরে এবং বিভিন্ন ভুল নীতিমালার প্রণয়ন অথবা যে কোন ব্যর্থতার জন্য সরকারের সমালোচনা করে। তাছাড়া বিরোধী দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে গণ সচেতনতা গড়ে তোলে।

৬ রাজনৈতিক দলগুলো জনমত গঠন করে। তারা বিভিন্ন বিষয়কে উত্থাপন করে ও সরকারের দৃষ্টি গোচরে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক দলের লক্ষ লক্ষ কর্মী ও সদস্য সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক দলেরই বর্দ্ধিত অংশ, যারা সমাজের বিভিন্ন অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। রাজনৈতিক দল জনগণের বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রায়ই সমাজের বিভিন্ন মতামতগুলো রাজনৈতিক দলের চাহিদা মত পদ্ধতিতে প্রকট হয়ে উঠে।

৭ রাজনৈতিক দল সরকার ব্যবস্থা ও সরকার দ্বারা রূপায়িত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোতে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। একজন সাধারণ নাগরিক তার সমস্যা নিয়ে সরকারি আধিকারিকের তুলনায় একজন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার কাছে যেতে অনেক বেশি পছন্দ করে। এই কারণেই জনগণ পুরোপুরি বিশ্বাস ভাজন না হলেও রাজনৈতিক দলকেই খুব কাছের মনে করে। জনগণের প্রত্যাশা ও দাবির প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোকে সংবেদনশীল হতে হবে। অন্যথায়, জনগণ পরবর্তী নির্বাচনে ঐ সব রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রত্যাখান করতে পারে।

## রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা (Necessity)

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী সম্পর্কিত এ তালিকাটিই হল উপরে উল্লেখিত প্রশ্নটির উত্তর ঃ যেহেতু রাজনৈতিক দল এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে সেহেতু রাজনৈতিক দল আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন। কিন্তু এখনও আমাদের এই প্রশ্নটি থেকে যায় যে কেন রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকে না। রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা আমরা তখনই বুঝতে পারি যখন রাজনৈতিক দলশূন্য সমাজ ব্যবস্থার কথা কল্পনা করি। যেমন, নির্বাচনে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীই হবে নির্দল। সুতরাং কেউই প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন কিংবা পরিমার্জন সম্পর্কিত কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে না। সরকার হয়ত বা গঠিত হবে কিন্তু তার উপযোগিতা হবে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। নির্বাচিত প্রতিনিধি তার কৃতকর্মের জন্য স্থানীয়ভাবে তার নির্বাচনি ক্ষেত্রের প্রতি কিছুটা দায়বদ্ধ থাকবে কিন্তু সমগ্র দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কেউই দায়বদ্ধ থাকবে না।

অনেক রাজ্যে দলবিহীন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতেও আমরা এই বিষয়টি চিন্তা করতে পারি। যদিও দল সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না তবুও এটা সাধারণত লক্ষ করা যায় যে গ্রামীণ ভোটাররা একাধিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্রত্যেক অংশই তাদের নিজস্ব প্রতিদ্বন্দ্বীদের ‘প্যানেল’ তৈরি করে। আসলে এই কাজটিই রাজনৈতিক দল করে থাকে। আর এই কারণেই পৃথিবীর সকল বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র পুরনো অথবা নতুন, উন্নত কিংবা অনুন্নত — সকল প্রকার রাষ্ট্রেই আমরা রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ করে থাকি।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাবের সাথে রাজনৈতিক দলের উত্থান সরাসরিভাবে সম্পর্কিত। যেমন আমরা লক্ষ করেছি যে, বৃহৎ সমাজব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রায় অপরিহার্য। কারণ সমাজ যখনই বৃহৎ কিংবা জটিল হয় তখন তাদের এমন কিছু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর গড়ে উঠা বিভিন্ন মতামতগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সেগুলোকে সরকারের সামনে উপস্থাপন করে। তারা এমন —

ঠিক আছে, মেনে নিলাম যে রাজনৈতিক দল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কিন্তু আমাকে বল কিসের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলকে জনগণের সমর্থন করা উচিত?

### টিকা

**শাসক দল ঃ** শাসক দল হল ঐ রাজনৈতিক দল যে সরকার পরিচালনা করে।

কিছু উপায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিনিধিকে এক সাথে করে একটা দায়িত্ববান সরকার গঠন করতে পারে। রাজনৈতিক দলের জন্য এমন কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে যার মাধ্যমে তারা সরকারের প্রতি সমর্থন কিংবা বিরোধ প্রদর্শন করতে পারে, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, বৈধতা বিচার, কিংবা প্রত্যাখান করতে পারে। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের এই প্রত্যাশাগুলো কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোই পূরণ করতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, রাজনৈতিক দল হল গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত।

**চলো পর্যালোচনা করি**

রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রদর্শিত কার্যাবলীর ভিত্তিতে এই চিত্রগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ কর। তোমার এলাকার এমন একটি চিত্র বা টুকরো খবর খুঁজে বের কর যা উল্লেখিত রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীগুলিকে তুলে ধরে।

(১) সিভি সুব্রমনিয়ম (২) কে গোপিনাথন (৩) এ চক্রবর্তী

(১) বিজেপির মহিলা মোর্চার সক্রিয় সদস্যরা বিশাখাপত্তনমে এল.পি.জি ও পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করছে।
(২) মাননীয় মন্ত্রী বিষাক্ত নেশার শিকারে পরিণত পরিবারগুলোকে এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করছেন।
(৩) ভুবনেশ্বরে সমাবেশরত সিপিআই(এম), সিপিআই, ওজিপি, জেডি(এস) ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের সক্রিয়কর্মী যারা পোস্কো (**POSCO**) নামক কোরিয়ার একটি ইস্পাত কোম্পানিকে উড়িশ্যা সরকার দ্বারা অনুমোদনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, কারণ কোরিয়ার এই কোম্পানিটি উড়িশ্যা সরকারের অনুমোদনক্রমে সেখানকার লোহা (**Iron**) চিন এবং কোরিয়ার কোম্পানিগুলোর কাছে রপ্তানি করছে।

## কত সংখ্যক রাজনৈতিক দল আমাদের প্রয়োজন? (How many parties should we have?)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের যে কোনও গোষ্ঠীই রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। এই সাধারণ একটি কারণেই প্রতিটি রাষ্ট্রে বিশাল সংখ্যক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আমাদের ভারতবর্ষে ৭৫০টিরও বেশি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশন অফিসে নিবন্ধন করেছে। কিন্তু এদের সবগুলিই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ দল নয়। এদের মধ্যে সামান্য কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দলই সাফল্যের সাথে নির্বাচনি প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করে সরকার গঠন করে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটি আসে যে, কত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কার্যকর রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের জন্য উত্তম?

কিছু রাষ্ট্রে, একটি মাত্র দলকেই সরকার গঠন এবং পরিচালনার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়।

## রাজনীতির নৈতিক শক্তি (A moral force in Politics)

নিম্নে বর্ণিত রূপক গল্পটির অন্তরালে মূল অনুপ্রেরণা হলেন শ্রী কিষেন পাটনায়েক (১৯৩০-২০০৪) যিনি কিষেনজি নামে অধিক পরিচিত। ১৯৬২ সালে উড়িশ্যার সম্বলপুর থেকে তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

বিকল্প রাজনৈতিক ধারা বলতে কিষেনজি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? সুধা, করুনা, শাহীন ও গ্রেসি এই চারজনের আলোচনায় এই প্রশ্নটি উঠে আসে। এই চারজন মহিলাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শক্তিশালী গণ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। প্রতিদিনকার আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসে এই চারজন বিদুষী মহিলা ভবিষ্যৎ গণ আন্দোলনের একটি নতুন বিকল্প ধারার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্য উড়িশ্যার একটি গ্রামে মিলিত হন।

পর্যায়ক্রমে তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন কিষেনজি, যিনি দেশের সকল আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর কাছে ছিলেন পরম বন্ধু, নৈতিক পথ প্রদর্শক ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তিনি যুক্তি দিয়ে বলতেন গণ আন্দোলনগুলোর উচিত প্রকাশ্যে রাজনীতি করা। তাঁর যুক্তি ছিল সাধারণ কিন্তু শক্তিশালী। একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গড়ে উঠা আন্দোলন ততক্ষণ পর্যন্ত উপযোগী হয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবনের যে কোনও একটি দিকের প্রেক্ষাপটে সীমিত সাফল্যতা অর্জন করতে চাই। কিন্তু যদি আমরা জীবনের কোন একটি দিক নিয়ে মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধন করতে, কিংবা রূপান্তর ঘটাতে চাই তাহলে রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য। গণ আন্দোলনের আবশ্যকি কর্তব্য হল এমন একটি বিকল্প রাজনৈতিক ধারার প্রবর্তন করা যা রাজনীতির অঙ্গানে নৈতিক শক্তি হিসাবে কাজ করে। তার মতে, এটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কারণ চলমান রাজনৈতিক দলগুলো প্রকৃত সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

গ্রেসি বলল, "তবে কিষেনজি তার প্রস্তাবিত সংগঠনের কোন নির্দিষ্ট রূপরেখা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেননি। তিনি শুধু একটি বিকল্প রাজনীতির ধারা অথবা একটি তৃতীয় শক্তির কথা বলেছেন। তাহলে তিনি কি নতুন কোনও রাজনৈতিক দলগঠনের কথা বলেছিলেন? সে মনে করত পুরনো ধাঁচের কোন রাজনৈতিক দল সমাজ পরিবর্তনের সঠিক উপকরণ হতে পারে না।"

সুধা গ্রেসির সাথে সহমত পোষণ করে বলল " আমি এই বিষয়ে অনেকবার ভেবেছি। আমিও এই বিষয়টির সাথে একমত যে, বাস্তুচ্যুতি, বিশ্বায়ন, জাতি ও লিঙ্গা বৈষম্য, বিকল্প উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা যত আন্দোলন করেছি তার সবগুলিই ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু যখনই আমরা কোন রাজনৈতিক দল গঠন করব তখনই এত বছর ধরে আমাদের অর্জিত সুনাম বিলীন হয়ে যাবে। এই অবস্থায় জনগণ তথাকথিত রাজনৈতিক দল ও আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখবে না।"

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে করুনা বলল, "তাছাড়া", " আমরা এটা লক্ষ করেছি যে, চলমান রাজনৈতিক দলগুলোর উপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমেও অনেক কিছু অর্জন করা যায়। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলোতে আমরা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার ফল খুব আশা ব্যাঞ্জক হয়নি। জনগণ আমাদের কাজ ভালোবাসে এবং প্রশংসাও করে। কিন্তু যখনই নির্বাচন ঘনিয়ে আসে তখন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর শরণাপন্ন হয়।"

শাহীন তাদের সাথে সহমত পোষণ না করে বলল, "চলো, ব্যাপারটা স্পষ্ট করে নেই। কিষেণজি মনে প্রাণে চাইতেন যে সকল গণ আন্দোলনগুলো মিলে যেন একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। যদিও তাঁর প্রত্যাশা ছিল নতুন রাজনৈতিক দলটি যেন তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলোর তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়। আসলে তিনি রাজনৈতিক বিকল্পের কথা বলেন নি, বরং বিকল্প ধরনের রাজনীতির কথা বলেছেন।"

জল জঙ্গাল এবং জমিন
এই সব হোক জনগণের অধীন!!

© Zuban

**কিষেন জি এখন আর বেঁচে নেই। তাহলে এই চারজন সমাজকর্মীর প্রতি তোমার সুপারিশ কি হবে? তাদের কি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা উচিত? একটি রাজনৈতিক দল কি রাজনীতির অঙ্গানে নৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে? ঐ বিকল্প রাজনৈতিক দলটির প্রকৃতি বা রূপরেখা কি হওয়া উচিত?**

নবম শ্রেণিতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, চিন দেশে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিরই শাসন করার অনুমোদন রয়েছে। যদিও, আইনগতভাবে রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা জনগণের আছে কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত হয় না কারণ সেখানকার নির্বাচনি ব্যবস্থা ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা অনুমোদন করে না। একদলীয় ব্যবস্থাকে আমরা ভালো কোন বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করি না কারণ এটি গণতন্ত্রের সঠিক পদ্ধতি নয়। যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমপক্ষে দুটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থাকা আবশ্যক যাতে তারা নির্বাচনের সময় পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে সুস্থ ও অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

কিছু কিছু রাষ্ট্রে, দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যেই সাধারণত ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। যদিও অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে, তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জাতীয় আইন সভায় কিছু আসনও পান। কিন্তু কেবলমাত্র প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করার সুযোগ পায়। এ ধরনের ব্যবস্থাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য দ্বি দলীয় ব্যবস্থার অন্যতম উদাহরণ।

যদি কয়েকটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে, এবং কমপক্ষে দুই বা ততোধিক দল নিজেদের শক্তির উপর ভর করে কিংবা অন্যদের সাথে জোট গঠনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সুযোগ পায়, তাহলে এই ধরনের অবস্থাকে আমরা বহুদলীয় ব্যবস্থা বলি। ভারতে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এক সাথে জোট গঠন করার মাধ্যমে সরকার গঠন করে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় তখন একে বলা হয় জোট। উদাহরণ স্বরূপ, ২০০৪ সালে ভারতের সংসদীয় নির্বাচনে এ ধরনের তিনটি জোট গঠন করা হয়েছিল। যেমন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (NDA), সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (UPA) এবং বাম মোর্চা (Left Front)। বহুদলীয় ব্যবস্থা কখনও কখনও খুব জটিল হয় এবং সমাজকে রাজনৈতিক অস্থিরতার দিকে ঠেলে দেয়। পাশাপাশি, এই ব্যবস্থায় জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাগুলো রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পায়।

তাহলে, কোন ব্যবস্থাটি উত্তম? এ সাধারণ প্রশ্নটির উৎকৃষ্ট উত্তর হল যে এটা খুব ভালো প্রশ্ন নয়। কোনো দেশই নিজে থেকে দলীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। আর এটা নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতি, সামাজিক এবং আঞ্চলিক বিভাজন বা বৈচিত্র্যতা, দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদির উপর। এই অবস্থাগুলিকে খুব সহসা পরিবর্তন করা যায় না। প্রতিটি রাষ্ট্রেই তার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ হল, দেশটি সামাজিক ও ভৌগোলিকভাবে এত বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ যে মাত্র দুটি রাজনৈতিক দল দ্বারা এর বিকাশ সম্ভব নয়। কোন ব্যবস্থাই সর্বাবস্থায় সব রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ হয় না।

আমি অবাক হই এই ভেবে যে কিভাবে রাজনৈতিক নেতারা এ ধরনের জোট ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। আমি তো সব রাজনৈতিক দলের নামও একসাথে মনে করতে পারি না।

চলো উল্লেখিত আলোচনার অভিজ্ঞতাকে আমরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চলমান দলীয় ব্যবস্থার উপর প্রয়োগ করি। এখানে তিন ধরনের রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যা বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমান। প্রত্যেকটা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তুমি কি কমপক্ষে দুটি রাজ্যের নাম বলতে পারো?

- দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা
- বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং দুটি জোট
- বহুদলীয় ব্যবস্থা

# রাজনৈতিক দলে গণ অংশগ্রহণ
# (Popular participation in Political parties)

এটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, রাজনৈতিক দলগুলো বর্তমানে সঙ্কটের সম্মুখীন কারণ তাদের জনপ্রিয়তা অনেকটাই তলানিতে এবং বেশির ভাগ নাগরিক এদের সম্পর্কে উদাসীন। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ করে যে এই বিশ্বাসটি ভারতের ক্ষেত্রেও আংশিকভাবে সত্য। কয়েক দশক ধরে পরিচালিত বিশাল সংখ্যক নমুনা সমীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে ঃ

- দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের আস্থা অর্জনে খুব বেশি সফল হয়নি। যে সকল জনগণ মনে করে যে রাজনৈতিক দলের উপর আস্থা 'কম' অথবা 'নেই' তাদের সংখ্যার অনুপাত ঐ সকল জনগণের তুলনায় বেশি যারা মনে করে যে তারা রাজনৈতিক দলকে 'সাধারণভাবে' কিংবা 'গভীরভাবে' বিশ্বাস করে।
- এই তথ্যটি বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সত্য। সমগ্র পৃথিবীতে যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর জনগণের আস্থা খুব কম, রাজনৈতিক দল তাদের মধ্যে অন্যতম।
- তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ করা যায়। যে সকল জনগণ মনে করে যে তারা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য, ভারতে এ ধরনের জনগণের অনুপাত দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, জাপান এবং কানাডার মতো উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বেশি।
- বিগত তিন দশক ধরে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যার অনুপাত ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে।
- যে সকল জনগণ মনে করে যে তারা 'রাজনৈতিক দলের খুব ঘনিষ্ঠ' তাদের অনুপাতও ভারতে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী।

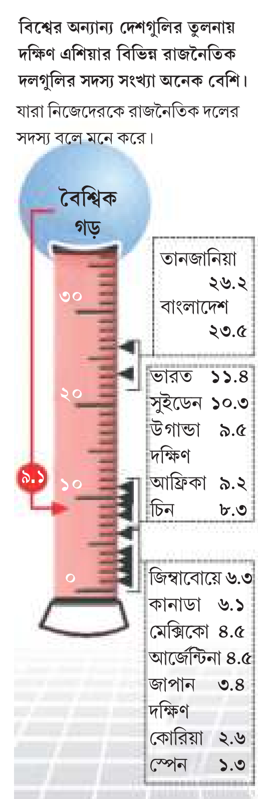

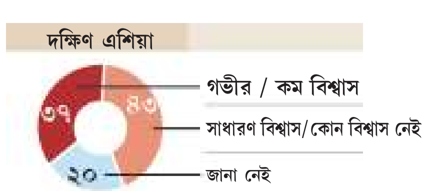


Source: SDSA Team, *State of Democracy in South Asia*, Delhi: Oxford University Press, 2007

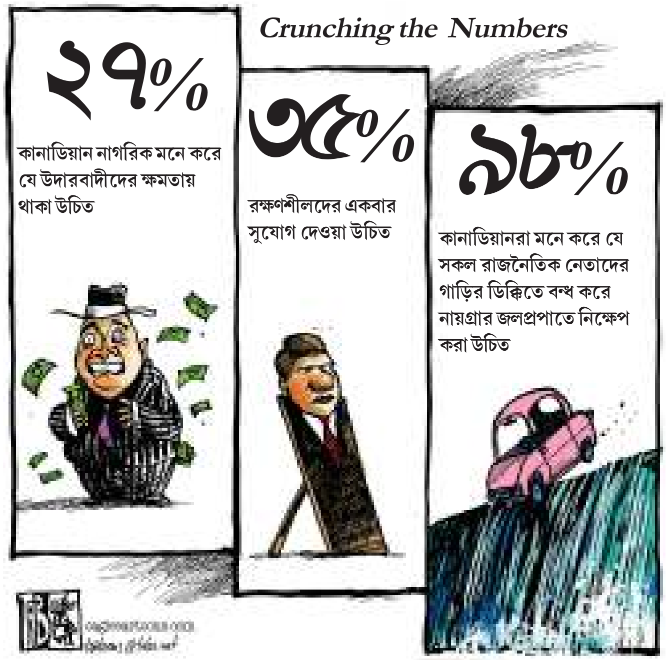


© Tab - *The Calgary Sun*, Cagle Cartoons Inc.

ব্যঙ্গচিত্রগুলি কি পূর্বের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তথ্যচিত্রগুলোকে প্রতিফলিত করে?

## জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ (National parties)

বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি অনুসরণকারী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে দুই ধরনের রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এক ধরনের রাজনৈতিক দল একটি মাত্র অঙ্গরাজ্যে কার্যকর থাকে আবার কিছু রাজনৈতিক দল একাধিক অঙ্গরাজ্যে অথবা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিয়াশীল থাকে। ভারতের ক্ষেত্রেও এমনটা লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র দেশব্যাপী ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোকে ‘জাতীয় দল’ বলা হয়। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যেই তাদের শাখা রয়েছে। জাতীয়ভাবে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা, কর্মসূচি কিংবা কৌশলগুলিই অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত রাজনৈতিক দলের শাখাসমূহ সাধারণত অনুসরণ করে।

দেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন করিয়ে নিতে হয়। যদিও নির্বাচন কমিশন সাধারণত সকল রাজনৈতিক দলের সাথে সমান আচরণ করে, তবে বড় ও প্রতিষ্ঠিত দলসমূহকে বিশেষ কিছু সুবিধা প্রদান করে। বৃহৎ দলগুলোকে স্বতন্ত্র নির্বাচনি প্রতীক দেওয়া হয়, যেগুলোকে শুধুমাত্র স্বীকৃত দল দ্বারা মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বীগণ নির্বাচনের সময় ব্যবহার করতে পারে। যে সব দল এই ধরনের সুবিধা কিংবা অন্যান্য বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে তারা মূলত নির্বাচন কমিশন দ্বারা ‘স্বীকৃত’। এই জন্যই তাদেরকে ‘স্বীকৃত রাজনৈতিক দল’ বলা হয়। স্বীকৃত দল হিসাবে মর্যাদা পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক ভোট এবং আসনের অনুপাত অর্জন করতে হয়। যেমন রাজ্যভিত্তিক কিংবা আঞ্চলিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দলকে সেই রাজ্যের মোট ভোটের কমপক্ষে ছয় শতাংশ পেতে হয় এবং সে রাজ্যের বিধানসভায় কমপক্ষে দুইটি আসনে জয়লাভ করতে হয়। অন্যদিকে, জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে লোকসভা অথবা চারটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে মোট ভোটের কমপক্ষে ছয় শতাংশ পেতে হয়, পাশাপাশি লোকসভায় কমপক্ষে চারটি আসনে জয়লাভ করতে হয়।

এই ধরনের যোগ্যতা মাপকাঠি অনুসারে ২০১৭ সালে আমাদের দেশে সাতটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। চলো এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানার চেষ্টা করি।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ও স্বীকৃতি সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন, visit http://eci.nic.in

**সর্ব ভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (All India Trinamool Congress AITC) ঃ-** এই দলটি ১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারিতে শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সর্ব প্রথম গঠিত হয়। ২০১৬ সালে এটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি পায়। এই দলের প্রতীক হল ঘাসফুল। এটি যুক্তরাষ্ট্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আদর্শ অনুসরণ করে। ২০১১ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন। অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং ত্রিপুরায়ও এই দলের উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৩.৮৪ শতাংশ ভোট পেয়ে লোকসভায় ৩৪টি আসনে জয় লাভ করে, ঐ সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায় চতুর্থ বৃহৎ দল হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

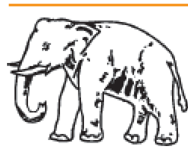

**বহুজন সমাজবাদী পার্টি (Bahujan Samajbadi Party BSP) ঃ-** ১৯৮৪ সালে কাঁশীরামের নেতৃত্বে এই দল গঠিত হয়। দলটির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো দলিত, আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু ইত্যাদি বহুজন সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাদের উন্নয়নের স্বার্থে ক্ষমতা দখল করা। এই দলের আদর্শ এবং শিক্ষার মূল অনুপ্রেরণা হলেন সাহু মহারাজ, মহাত্মা ফুলে, পেরিয়ার রামস্বামী নায়কর ও বাবা সাহেব আম্বেদকর। দলিত এবং নিপীড়িত জনগণের স্বার্থ সুরক্ষা ও উন্নয়নে দলটি সদা জাগ্রত থাকে। দলটির মূল কর্মক্ষেত্র হল উত্তরপ্রদেশ, তবে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি এবং পাঞ্জাবের মত পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতেও এই দলের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন নিয়ে উত্তরপ্রদেশে সরকার গঠন করে। ২০১৪ সালে লোকসভার নির্বাচনে মোট ভোটের চার শতাংশ পেলেও কোন আসনে জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

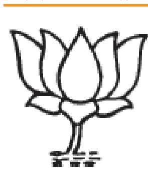

**ভারতীয় জনতা পার্টি (Bharatiya Janata Party (BJP) ঃ-** ১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দ্বারা গঠিত ভারতীয় জনসংঘ থেকে ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির উৎপত্তি হয়। মূল উদ্দেশ্য হল প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অখণ্ড মানবতাবাদ ও অন্ত্যোদয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক ও শক্তিশালী ভারত নির্মাণ করা। এই দলটির রাজনীতি ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু হল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ (বা হিন্দুত্ব)। এই দলের লক্ষ হল ভারতের সাথে জম্মু কাশ্মীরের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অখণ্ডতা, ধর্ম ও বর্ণ ভেদে ভারতে বসবাসকারী সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন নাগরিক আইন (Uniform Civil Code) চালু করা এবং ধর্মান্তকরণ নিষিদ্ধ করা। ১৯৯০ এর দশকে দলটির জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এক সময় এই দলের কর্মকাণ্ড উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এবং শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ ও উত্তরপূর্ব ভারত এবং গ্রামীণ এলাকায়ও দলটি সমানভাবে জনপ্রিয়। ১৯৯৮ সালে বিজেপি এর নেতৃত্বে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল সমৃদ্ধ জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) প্রথমবারের মতো কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ২৮২টি আসন নিয়ে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। বিজেপির নেতৃত্বে (এনডিএ) জোট এখনও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন।

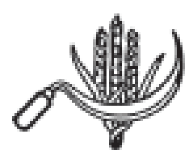

**ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (Communist Party of India (CPI)) ঃ-** ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৫ সালে গঠিত হয়। এই দলটি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং গণতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শে বিশ্বাসী। এই দল বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ এর বিরোধী। দরিদ্র, কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ উন্নয়নে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাহক হিসাবে গ্রহণ করে। ১৯৬৪ সালে নিজেদের মধ্যে বিভাজনের কারণে দলটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সিপিআই(এম) নামে নতুন দলের আবির্ভাব হয়। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে এই দলের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। বিগত বছরগুলোতে দলটির জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হ্রাস পায়। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে এই দল ১ শতাংশেরও কম ভোট পায় এবং মাত্র ১টি আসন লাভ করে। সম আদর্শের বিশ্বাসী দলগুলো নিয়ে শক্তিশালী বাম মোর্চা গঠনের ব্যাপারে এই দলটি সক্রিয়।

**ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ) (Communist Party of India (Marxist) CPI(M)) ঃ-** ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে গঠিত হয়। এই দলটি মার্কসবাদ লেনিনবাদী আদর্শের উপর বিশ্বাসী। এই রাজনৈতিক দল সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং গণতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং

সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধীতা করে। ভারতে আর্থ-সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই দলটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় ও সহায়ক বলে মনে করে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় এই দলের ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত, বিশেষ করে দরিদ্র, কারখানা ও কৃষি শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে খুব জনপ্রিয়। বিভিন্ন নতুন আর্থিক নীতিমালা যেমন দেশে বিদেশি পণ্য ও দ্রব্যের অবাধ প্রবেশ বা উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচণ্ড সমালোচক। পশ্চিমবঙ্গে দলটি বিরামহীন ৩৪ বছর ধরে শাসন ক্ষমতায় ছিল। ২০১৪ সালে লোকসভার নির্বাচনে এরা মোট ভোটের ৩ শতাংশ লাভ করে এবং ৯টি আসন দখল করে।

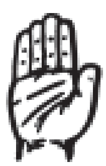

**ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress (INC) ঃ-** এই রাজনৈতিক দলটি কংগ্রেস নামে বহুল পরিচিত। পৃথিবীর অন্যতম পুরনো এই দলটি ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় এবং অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক দশক ধরে ভারতবর্ষে জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে এটি বৃহত্তর ভূমিকা  ভূমিকা পালন করে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস ভারতবর্ষকে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প গ্রহণ করে। এই দলটি স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে লাগাতার ক্ষমতাসীন ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্তও দেশ শাসন করে। ১৯৮৯ সালের পরে দলটির জনপ্রিয়তা কমে আসলেও সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দলের প্রতি সমর্থন প্রবাহমান রয়েছে। মতাদর্শগত দিক থেকে এটি একটি মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দল (পুরোপুরি ডানপন্থীও নয় বামপন্থীও নয়) যা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পক্ষাবলম্বন করে থাকে। দলটি ঐ সকল নতুন অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে যার মানবিক মুখ এখনও বিলীন হয়ে যায়নি। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রাক্তন ইউপিএ সরকারের নেতৃত্ব ছিল কংগ্রেস দলের হাতে। এই দলটি বর্তমানে লোকসভার প্রধান বিরোধী দল।

**জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দল (Nationalist Congress Party (NCP) ঃ-** ১৯৯৯ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজনের ফলে এই দলটি গঠিত হয়। এর মূল আদর্শ হল গণতন্ত্র, গান্ধিজির দ্বারা প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষতা, সমতা, সামাজিক ন্যায় ও যুক্তরাষ্ট্রবাদ। তাদের প্রত্যাশা হল সরকারের উচ্চপদীয় স্থানগুলো দেশের মূল নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়া। এটা মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, মণিপুর ও আসামের মতো রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০৪ সাল থেকে এই দলটি কংগ্রেসের সাথে জোট গঠনের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে শাসন পরিচালনা করে। কেন্দ্রীয় স্তরেও এনসিপি সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার (ইউপিএ) গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

## রাজ্যস্তরীয় বা আঞ্চলিক দল (State parties)

উল্লেখিত সাতটি রাজনৈতিক দল ছাড়া অন্যান্য বেশিরভাগ বৃহৎ দলগুলোকে নির্বাচন কমিশন 'রাজ্যস্তরীয় দল' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এদেরকে সাধারণত আঞ্চলিক দল বলা হয়। তবে দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে এই দলগুলো আঞ্চলিক নাও হতে পারে। এদের মধ্যে কোন কোন দল জাতীয় দল হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে যদিও তারা কিছু রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমাজবাদী পার্টি অথবা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের মতো কিছু দলের জাতীয় স্তরের সংগঠন রয়েছে এবং এদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিকভাবে ক্রিয়াশীল। আবার বিজু জনতা দল, সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, মিজু ন্যাশনাল ফ্রন্ট, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি ইত্যাদি দলগুলো আঞ্চলিক গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে।

বিগত তিন দশক ধরে, আঞ্চলিক দলগুলোর সংখ্যা এবং শক্তি অনেক বেড়েছে। যার ফলে ভারতীয় সংসদ বর্তমানে আরও বেশি বৈচিত্র্যতায় ভরপুর। ২০১৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন জাতীয় দলই লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। আর এই কারণে জাতীয় দলগুলো আঞ্চলিক দলের সাথে জোট গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রায় প্রত্যেক আঞ্চলিক দলই জাতীয় স্তরে কোন না কোন জোট সরকারে অংশদীর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এই অবস্থা আমাদের দেশের গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হতে সাহায্য করে আসছে। (পরের পৃষ্ঠায় এই দলগুলোর বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কিত মানচিত্রটি দেখ)

# ভারতের আঞ্চলিক দল সমূহ

(১৮ অক্টোবর ২০১৭ সালে প্রকাশিত)

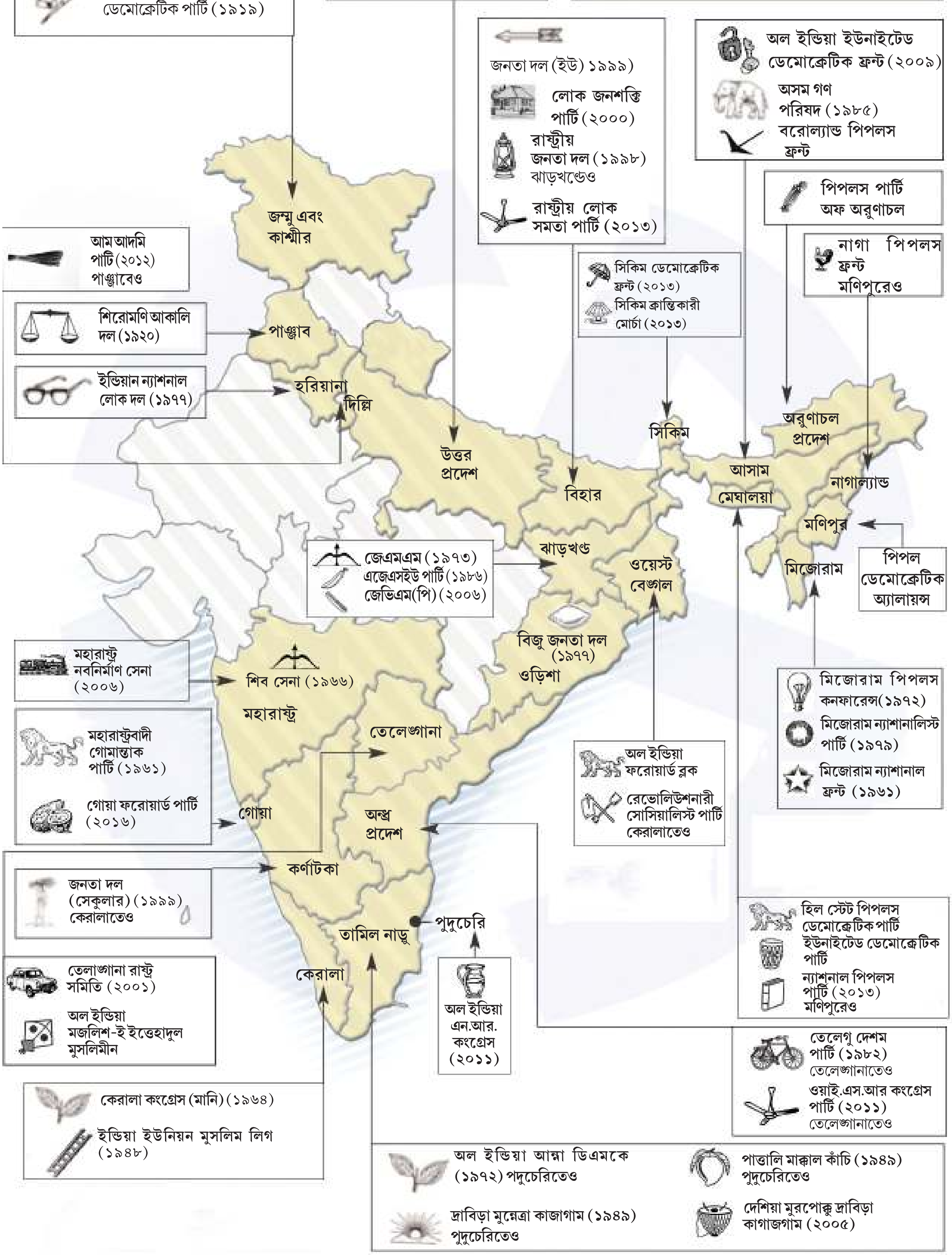


Map not to scale

## রাজনৈতিক দলের প্রতিবন্ধকতা সমূহ
## (Challenges to political parties)

আমরা ইতিমধ্যে এটা লক্ষ করেছি যে গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উপকরণ বা দৃশ্যমান মুখ, তাই গণতন্ত্র কার্যকারিতার সাথে যুক্ত সকল সমস্যার জন্য রাজনৈতিক দলকেই সাধারণত দায়ী করা হয়। সারা বিশ্বজুড়েই, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য জনগণ রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করে। আমাদের দেশেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সমস্যা জর্জরিত চারটি বিষয়ের উপরে জনগণ তাদের হতাশা কিংবা অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ সকল সমস্যা মোকাবিলার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সার্থক উপকরণ হিসাবে ক্রিয়াশীল তাকতে হবে।

**বার্লুস্কনী পাপেট থিয়েটার**

© Riber Hansson - *Svenska Dagbladet*, Cagle Cartoons Inc.

*বার্লস্কনী ছিলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি সে ইতালির একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। সে ১৯৯৩ সালে গঠিত ফর্জা ইতালিয়া নামক রাজনৈতিক দলের নেতা। তার কোম্পানি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, একটি বিখ্যাত প্রকাশনি সংস্থা, বিশ্ববরণ্য ফুটবল ক্লাব (এসি মিলান) এবং একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মালিক। এই ব্যঙ্গ চিত্রটি বিগত নির্বাচনের সময় প্রকাশ করা হয়।*

রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রতিবন্ধকতাটি হল দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রহীনতা। সারা বিশ্বজুড়ে যে কোন রাজনৈতিক দলের স্বাভাবিক প্রবণতা হল একজন কিংবা উচ্চস্তরে কয়েকজনের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা। রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় সদস্যদের তালিকা সংক্রান্ত কোনো প্রমাণাদির সংরক্ষণ করে না, প্রতিনিয়ত সাংগঠনিক বৈঠক করে না এবং নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে না। দলের অভ্যন্তরে কি ধরনের সিদ্ধান্ত কিংবা কৌশল নেওয়া হচ্ছে এ সম্পর্কে দলের সাধারণ সদস্যরা কিছুই জানতে পারে না। তারা এমন কোনো মাধ্যম কিংবা সূত্র খুঁজে পায় না যার ভিত্তিতে দলের সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। যার ফলে নেতারা দলের নামে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করে। যেহেতু একজন কিংবা কিছু সংখ্যক নেতা দলের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করে সেহেতু তাদের সাথে অসহমত পোষণকারী সদস্যরা দলে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো নারী সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণ মনোনয়ন কেন দেয় না? এটাও কি দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রহীনতার ফলশ্রুতি?

একজন সদস্য দলীয় মতাদর্শ কিংবা নীতিমালার প্রতি কতটুকু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ হল সে ব্যক্তি দলীয় নেতৃত্বের প্রতি কতটুকু অনুগত।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হল বংশানুক্রমিক নেতৃত্বের প্রথা, যা প্রথম প্রতিবন্ধকতাটির সাথেও সম্পর্কিত। যেহেতু বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল তাদের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অবাধ ও স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করে না সেহেতু সাধারণ কর্মীরা খুব কমই নেতৃত্বের সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে। সাধারণ কর্মীদের মধ্য থেকে যারা নেতায় পরিণত হয়েছে তারা হয় অসাধু উপায় অবলম্বন করেছে অথবা ক্ষমতাবান ব্যক্তি কিংবা তাদের পরিবারের আনুকূল্যের সুযোগ পেয়েছে। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পদগুলো বিশেষ একটি পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থা দলের সাধারণ সদস্যদের প্রতি চরম অন্যায় স্বরূপ। অনভিজ্ঞ অথবা জনসমর্থনহীন কোনও ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দখল করে তাহলে তা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের প্রবণতা বিশ্বের সকল দেশে এমনকি প্রাচীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও কম বেশি বর্তমান।

রাজনৈতিক দলের তৃতীয় প্রতিবন্ধকতা হল দলের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে নির্বাচনের সময় অর্থ ও পেশী শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাব। যেহেতু রাজনৈতিক দলের মৌলিক উদ্দেশ্য হল নির্বাচনে জয় লাভ করা, সেহেতু সহজ উপায়ে তারা তা অর্জন করতে চায়। তারা এমন প্রার্থীদের মনোনীত করে যারা বিত্তশালী কিংবা প্রচুর অর্থের জোগান দিতে পারে। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি তহবিলে অর্থ প্রদানকারী বিত্তশালী ব্যক্তি ও কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক দলের নীতি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল এমন অপরাধী ব্যক্তিদেররকে মনোনীত করে যারা পেশী ও অর্থ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনে সহজে জয় লাভ করার ক্ষমতা রাখে। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রেমীরা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ধনী ব্যক্তি ও বড় বড় কোম্পানিগুলোর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিয়ে বিশেষভাবে শঙ্কিত।

চতুর্থ প্রতিবন্ধকতা হল নির্বাচক মণ্ডলীর জন্য রাজনৈতিক দল দ্বারা অর্থবহ বিকল্প পছন্দের ব্যবস্থা না করা। নির্বাচক মণ্ডলীর সামনে প্রয়োজনীয় বিকল্প উপস্থাপনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বতন্ত্র চিন্তা ভাবনা করতে হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত বৈচিত্র্যতার পতন ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ব্রিটেনে লেবার পার্টি ও কনজারবেটিভ পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত ভিন্নতা বর্তমানে প্রায় নেই বললেও চলে। দেশের মৌলিক বিষয়গুলোতে তারা সহমত পোষণ করে। কিন্তু কেবলমাত্র নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত উপায় নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। আমাদের দেশেও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত বিভিন্নতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। যে সকল নির্বাচক মণ্ডলী সত্যিকার অর্থে স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়নের পক্ষে, তখন তাদের সামনে কোন বিকল্প থাকে না। কখনও কখনও জনগণ নিজেদের পছন্দ মত বিশেষ কোন ব্যক্তিকে নেতা হিসাবে নির্বাচন করতে পারে না, কারণ একই প্রকৃতির নেতারা সময়ে সময়ে দল পরিবর্তন করতে থাকে।

© Huffaker - Cagle Cartoons Inc., 16 June 2004

ব্যঙ্গ চিত্রটি রিপাব্লিকান দল থেকে নির্বাচিত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের সময় আঁকা হয়েছে। দলটির প্রতীক হল হাতি। ব্যঙ্গচিত্রটি ব্যাখ্যা করতে চাইছে যে আমেরিকার কর্পোরেটগুলো দেশের সমস্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে।

তুমি এখন প্রচুর টাকার মালিক। তাহলে কেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছ?

© Manjul - *DNA*

এর অর্থ কি এই যে গণতন্ত্রে জনগণ শুধু অর্থ উপার্জনের জন্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে? এটা কি সত্য নয় যে কিছু কিছু রাজনীতিবিদ এমনও আছেন যারা জনকল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ?

এই অধ্যায়ে বর্ণিত কোন কোন প্রতিবন্দকতাগুলো এই ব্যঙ্গাচিত্র সমূহ দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে তা কি তুমি চিহ্নিত করতে পার (৮৩ থেকে ৮৫ নং পৃষ্ঠা)? রাজনীতিতে ক্ষমতাও অর্থের অপব্যবহার কিভাবে রোধ করা যায়?

## রাজনৈতিক দলের সংস্কার কীভাবে সম্ভব? How can parties be reformed?)

উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক দলের সংস্কার খুবই প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হল ঃ রাজনৈতিক দলগুলো কি সংস্কার চায়? যদি চায় তাহলে বাঁধা কোথায়? আর যদি না চায় তাহলে কি জোর করে তাদের সংস্কার করা সম্ভব? সমগ্র বিশ্বের নাগরিকরা আজ এ প্রশ্নের সম্মুখীন। এটি এত সাধারণ প্রশ্ন নয় যার উত্তর সহজে দেওয়া সম্ভব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বকারী নেতারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনগণ তাদের পরিবর্তন করতে পারে বটে কিন্তু বিকল্প হিসাবে যারা আসবেন তারাও অনুরূপ রাজনৈতিক দল দ্বারা মনোনীত এবং প্রায় সম মানসিকতার হয়ে থাকেন। সুতরাং পূর্বের কিংবা পরের সকল নেতারাই যদি আগ্রহী না হন তাহলে কীভাবে অন্য কেউ তাদের জোর করে সংস্কারের পথ দেখাবে।

চলো আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সংস্কারের নিমিত্তে গ্রহণ করা সাম্প্রতিক কিছু প্রচেষ্টা ও সুপারিশ মালার দিকে লক্ষ্য করি ঃ

- নির্বাচিত এম.এল.এ এবং এম পি গণ যাতে নিজেদের দলত্যাগ করতে না পারে সেজন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে কারণ অনেক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মন্ত্রী হওয়ার প্রত্যাশায় অথবা নগদ অর্থরাশির লোভে দলত্যাগ করার মত

### টীকা

**দলত্যাগ ঃ** আইন সভায় নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি যখন নিজ দলের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে ভিন্ন একটি দলের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে তখন এই অবস্থাকে দলত্যাগ বলা হয়।

© Keshav - *The Hindu*

তুমি কি মনে কর এ ধরনের সংস্কার কর্মসূচি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে?

অনৈতিক কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। বর্তমানে আইন অনুসারে যদি কোনো এমএলএ অথবা এম পি দলত্যাগ করে তাহলে আইনসভায় সে তার আসন হারাবে। এই নতুন আইনটি দলত্যাগের মত ঘটনা হ্রাস করতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি এই আইন যে কোন ক্ষোভ কিংবা মতবিরোধকে আরও বেশি জটিল করে তুলেছে। এখন এম পি এবং এমএলএরা দলীয় নেতাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য।

- নির্বাচনে অর্থ এবং দুর্বৃত্তদের প্রভাব কমানোর জন্য সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ নির্দেশ জারি করেছে। এখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীকেই বাধ্যতামূলক হলফনামার মাধ্যমে সম্পদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তার বিরুদ্ধে আরোপিত কোনো অপরাধ মামলা আছে কিনা সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হয়। এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রার্থীদের ব্যাপারে অনেক তথ্য জানতে পারে। কিন্তু প্রার্থী দ্বারা প্রদত্ত তথ্য যদি সঠিক হয় কিংবা না হয় তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ করার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই। এখনও আমরা জানি না এই নতুন ব্যবস্থা রাজনীতিতে অর্থ এবং অপরাধের লাগাম টানতে পেরেছে কি না।
- নির্বাচন কমিশন এক নির্দেশিকার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নিয়মিত সাংগঠনিক নির্বাচন এবং সময়মত আয়কর সংক্রান্ত প্রমাণাদি জমা করাকে বাধ্যতামূলক করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্দেশিকা অনুসরণ করে থাকলেও তা অনেকটা কাগজেই সীমাবদ্ধ। এটা স্পষ্ট নয়, এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক দলগুলোর আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এগুলো ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

- রাজনৈতিক দলগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা উচিত। এই আইনটি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের জন্য বাধ্যতামূলক করা উচিত। যাতে তারা সদস্যদের জন্য নিবন্ধনের ব্যবস্থা করে; দলীয় সংবিধান অনুসরণ করে, সর্বোচ্চ পদগুলো পূরণের জন্য অবাধ ও উন্মুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং আভ্যন্তরীণ কলহ মোকাবিলার জন্য একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠন করে।
- রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এটা বাধ্যতামূলক করা উচিত যাতে তারা নির্বাচনের সময় মহিলাদের জন্য কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মনোনয়ন নির্ধারিত রাখে। অনুরূপভাবে দলের সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী কমিটিতে মহিলাদের জন্য যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।
- নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় তহবিলের ব্যবস্থা থাকা উচিত। নির্বাচনি ব্যয় মেটানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থ প্রদান করা উচিত। এ ধরনের সহায়তা তরল জ্বালানি, কাগজপত্র, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দেওয়া যেতে পারে। অথবা বিগত নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে রাজনৈতিক দলগুলোকে নগদ অর্থ রাশিও দেওয়া যেতে পারে।

উল্লেখিত পরামর্শগুলো এখনও রাজনৈতিক দল দ্বারা সার্বিকভাবে গৃহীত হয়নি। এই পরামর্শগুলো গ্রহণ করা হলে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হতে পারে। তবে রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর আইনগত সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের একটু সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ অতি নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক দলের সমস্যাগুলো উল্টো বাড়িয়ে দিতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ রাজনৈতিক দলগুলোকে আইন উপেক্ষা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অপছন্দের কোনো আইন পাশ করার ক্ষেত্রে কখনও রাজি হবে না।

অন্য দুটি উপায়েও রাজনৈতিক দলের সংস্কার করা যেতে পারে। প্রথমটি হল জনগণ রাজনৈতিক দলের উপর বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে। গণ বিক্ষোভ, প্রচার কিংবা সমবেত আবেদনের মাধ্যমে এ ধরনের চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সাধারণ জনগণ, চাপসৃষ্টিকারী ও আন্দোলনকারী গোষ্ঠী এবং

## টীকা

**হলফনামা ঃ** বিশেষ সরকারি আধিকারিকের কাছে পেশ করা এমন একটি স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্র যেখানে একজন ব্যক্তি শপথ সহকারে তার ব্যক্তিগত তথ্য বর্ণনা করে।

গণমাধ্যম এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যখনই রাজনৈতিক দলগুলো এটা অনুধাবন করবে যে প্রয়োজনীয় সংস্কার গ্রহণ না করলে তারা জনসমর্থন হারাতে পারে, তখন তারা প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হবে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলের উন্নতি সম্ভব হবে যদি সংস্কার পন্থী জনগণ রাজনৈতিক দলে সরাসরি যুক্ত হয়। আসলে গণতন্ত্রের গুণগতমান নির্ভর করে গণ অংশগ্রহণের মাত্রার উপর। যদি সাধারণ জনগণ বাইরে থেকে শুধু সমালোচনা করে কিন্তু রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না, তখন রাজনৈতিক দলের সংস্কার কঠিন হয়ে পড়ে। নেতিবাচক রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা কেবলমাত্র ইতিবাচক রাজনীতির দ্বারাই সম্ভব। শেষ অধ্যায়ে আমরা-এ বিষয়টির উপর আলোচনা নিয়ে আবার ফিরে আসব।

## অনুশীলনী

১) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে বর্ণনা কর?

২) রাজনৈতিক দল কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়?

৩) রাজনৈতিক দলের সংস্কারের ক্ষেত্রে এমন কিছু পরামর্শ দাও যাতে তারা শক্তিশালী হয় এবং ফলপ্রসূভাবে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারে?

৪) রাজনৈতিক দল কী?

৫) রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৬) একদল জনগণ মিলেমিশে যখন নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে এবং সরকারি ক্ষমতা লাভ করে তখন তাদের বলা হয় —।

৭) প্রথম তালিকাটিকে (সংগঠন বা দল এবং সংগ্রাম) দ্বিতীয় তালিকায় (জোট বা মোর্চা) সাথে মেলাও এবং নিম্নে প্রদত্ত কোডের সাহায্যে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর।

| | প্রথম তালিকা | দ্বিতীয় তালিকা |
|---|---|---|
| ১. | কংগ্রেস পার্টি | ক) জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা |
| ২. | ভারতীয় জনতা পার্টি | খ) রাজ্য দল |
| ৩. | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসীয়) | গ) সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা |
| ৪. | তেলেগু দেশম পার্টি | ঘ) বামফ্রন্ট |

| | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|---|
| (অ) | গ | ক | খ | ঘ |
| (আ) | গ | ঘ | ক | খ |
| (ই) | গ | ক | ঘ | খ |
| (ঈ) | ঘ | গ | ক | খ |

৮) নিম্নোক্ত কোন ব্যক্তি বহুজন সমাজবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা?
   ক) কাঁশীরাম
   খ) সাহু মহারাজ
   গ) বি. আর. আম্বেদকর
   ঘ) জ্যোতিবা ফুলে

৯) ভারতীয় জনতা পার্টির পথ নির্দেশক মতাদর্শ কি?
   ক) বহুজন সমাজ
   খ) বিপ্লবী গণতন্ত্র
   গ) সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ
   ঘ) আধুনিকত্ব

১০) রাজনৈতিক দল সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখিত বক্তব্যগুলো বিবেচনা কর।

ক) রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের অধিক আস্থা উপভোগ করে না।

খ) সর্বোচ্চ নেতাদের কেলেঙ্কারির কারণে রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই সমালোচিত হয়।

গ) সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন নেই।

**উল্লেখিত বক্তব্যগুলোর কোনগুলি সঠিক?**

অ) ক, খ এবং গ    আ) ক এবং খ    ই) খ এবং গ    ঈ) ক এবং গ।

১১) নিম্নের রচনাংশটি পড় এবং প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের একজন নামকরা অর্থনীতিবিদ। দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে নেওয়া বিভিন্ন প্রচেষ্টার জন্য তিনি বহু আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হন। ২০০৬ সালে তিনি এবং তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন এবং আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ নেতৃত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক নতুন বাংলাদেশ গঠন করা। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে গতানুগতিকতা থেকে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দলই নতুন ও সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে। তাঁর নতুন দল তৃণমূল স্তর থেকেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

"নাগরিক শক্তি" নামক নতুন দল উদ্বোধনের প্রাক্কালেই বাংলাদেশে বিশাল আলোড়ন ও বিতর্ক শুরু হয়। তার এই সিদ্ধান্তকে অনেকে স্বাগত জানালেও অনেকে আবার এর সমালোচনাও করে। সাহিদুল ইসলাম নামে একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেন, "এখন আমার বিশ্বাস ভালো এবং মন্দ তথা কল্যাণকামী সরকার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে এক নতুন সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা নতুন সরকার শুধু দুর্নীতি থেকে দূরেই থাকবে না বরং এর বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম এবং কালো টাকা উদ্ধার হবে সরকারের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার।"

কিন্তু পরম্পরাগত রাজনৈতিক দলগুলো যারা দশকের পর দশক ধরে দেশীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে, তারা এ পদক্ষেপে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি.এন.পি) একজন প্রবীণ সদস্য বলেন, "ডঃ মোহাম্মদ ইউনুসের নোবেল প্রাপ্তির ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই, কিন্তু রাজনীতি একটি ভিন্ন ব্যাপার; সমস্যা সংকুল এবং বহুলাংশে বিতর্কমূলক।" এ ব্যাপারে অন্যান্য অনেকেও তার কঠোর সমালোচনা করে। একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের জিজ্ঞাসা, রাজনীতিতে তার হঠাৎ আগমন কেন। "বহিরাগত পরামর্শদাতারাই কি তাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিকল্পিতভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে।"

তোমার মতে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা কি ইউনুসের সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল?

উল্লেখিত মন্তব্যগুলোর কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত আশঙ্কার সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতে একটি নবগঠিত রাজনৈতিক দল কীভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় স্বতন্ত্র হতে পারে? তুমি যদি এই নতুন রাজনৈতিক দলটির সংগঠকদের একজন হতে তাহলে কীভাবে এর স্বপক্ষ অবলম্বন করতে?

অনুশীলনী

অধ্যায় ৭

# গণতন্ত্রের ফলাফল
# (Outcomes of Democracy)

## সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Overview)

যেহেতু আমরা গণতন্ত্র নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর উপসংহার টানতে শুরু করেছি সেহেতু এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনার বাইরে গিয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি। যেমন— গণতন্ত্রের কাজ কী? গণতন্ত্র থেকে যুক্তি সঙ্গতভাবে আমরা কী পরিণাম প্রত্যাশা করতে পারি? গণতন্ত্র কি বাস্তব জীবনের প্রত্যাশাগুলো পূরণ করতে পারে? আমরা যা দিয়ে শুরু করতে পারি তাহল গণতন্ত্রের ফলাফলগুলো কীভাবে মূল্যায়ন করা যায়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা এবং তার বাস্তব পরিণামের দিকে লক্ষ করতে পারি। প্রত্যাশাগুলোর বিভিন্ন দিক হল, সরকারের গুণগত মান, অর্থনৈতিক কল্যাণ, বৈষম্য, সামাজিক বৈচিত্র্যতা, সামাজিক সংঘর্ষ এবং সর্বশেষে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদা। এবিষয়ে আমাদের সর্বশেষ মতামত অত্যন্ত ইতিবাচক ও গ্রহণযোগ্য। এ ধরনের মতামত আমাদেরকে পরবর্তী ও শেষ অধ্যায়ে গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা কিংবা সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে উজ্জীবিত করে।

# আমরা কীভাবে গণতন্ত্রের ফলাফল মূল্যায়ণ করি?
## (How do we assess democracy's outcomes?)

আমরা কি ম্যাডাম লিংডোর ক্লাসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি? ঐ ক্লাসটিকে আমি দারুণ ভালোবাসি কারণ ওখানে বিদ্যার্থীদের উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।

তোমার কি মনে আছে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে বিদ্যার্থীরা গণতন্ত্র নিয়ে ম্যাডাম লিংডোর সাথে বিতর্ক করেছিল? এটা নবম শ্রেণির পাঠ্য পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই বিতর্ক থেকে এটা বেরিয়ে এসেছিল যে স্বৈরতন্ত্র অথবা এধরনের অন্য কোনো বিকল্পের তুলনায় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। আমাদেরও মনে হয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। কারণ:

- এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সমতা বৃদ্ধি পায়।
- ব্যক্তি মর্যাদা উন্নত হয়।
- সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ব্যবস্থা গুণমান সম্পন্ন হয়।
- সংঘর্ষ নিরসনের পথ সুগম হয়।
- ভুলকে শুদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উল্লেখিত প্রত্যাশাগুলো কি পূরণ হয়েছে? আমাদের চারপাশের মানুষগুলোর সাথে যখন কথা বলি তখন দেখি এদের বেশির ভাগই রাজন্য শাসন, সামরিক শাসন অথবা ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার তুলনায় গণতন্ত্রকেই বেশি সমর্থন করে। কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই আবার চলমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিও সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং আমাদের সামনে উভয় সংকট। নীতিগতভাবে দেখা যায় গণতন্ত্রই ভালো। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এতটা ভালো অনুভব হয় না। এই ধরনের উভয় সংকটই গণতন্ত্রের ফললাফলের উপর চিন্তা করতে আমাদের বাধ্য করে। শুধুমাত্র নীতিগত কারণেই কি আমরা গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিই? নাকি এই ব্যবস্থাকে সমর্থনের পেছনে বিবেচ্য কোনো কারণ আছে?

বর্তমান বিশ্বের প্রায় একশোরও বেশি দেশ কোনো না কোনোভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক হিসাবে দাবি করে। যেমন আমাদের আনুষ্ঠানিক সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি, জনগণের মৌলিক অধিকার ইত্যাদি রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বেশিরভাগ দেশেই বর্তমান। কিন্তু সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামগ্রিক সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সকলেই একে অপর থেকে আলাদা। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে এরা একে অপর থেকে পৃথক। যেহেতু এরা সকলেই গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে সেহেতু এদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমরা কি বিশেষ কিছু আশা করতে পারি?

গণতন্ত্রের প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং আবেগ আমাদের এমন অবস্থান নিতে বাধ্য করে যে সকল আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারাই করা সম্ভব। তাই যখনই আমাদের কোনো প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় তখনই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করি। অথবা সন্দেহ করতে থাকি যে আমাদের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কিনা। গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার প্রথম পদক্ষেপ হল যে, গণতন্ত্র হল শুধুমাত্র একটি সরকারী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র প্রত্যাশা পূরণের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে। এই বাতাবরণকে কাজে লাগিয়ে নাগরিকদেরকেই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। চলো আমরা এমন কতগুলো বিষয় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করি যা আমরা গণতন্ত্র থেকে আশা করি। পাশাপাশি বাস্তবে গণতন্ত্র আমাদের কী দিয়েছে সে বিষয়েও প্রামাণ্যগুলো নিরীক্ষা করি।

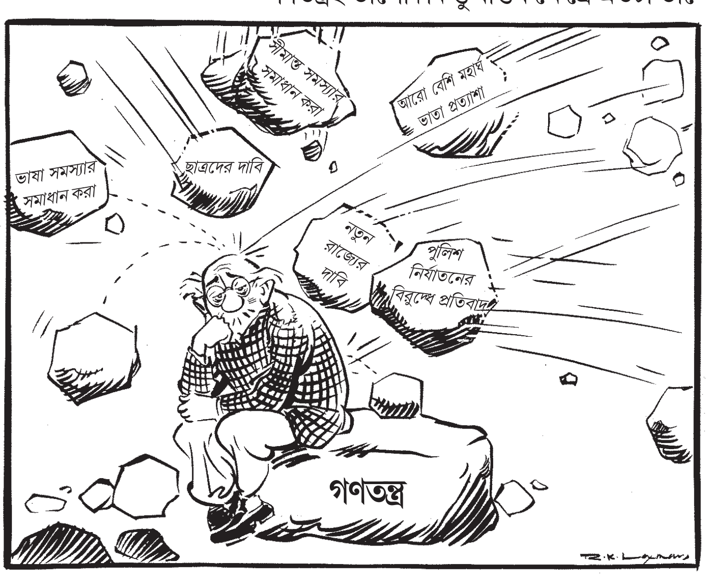


© RK Laxman - *Brushing up the years*

*গণতন্ত্রের অর্থ কি শুধুমাত্র নানাবিধ চাপ সহ্য করার ও বিশাল সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন দাবি দাওয়া সমূহকে গ্রহণ কিংবা সমন্বয় করা?*

# দায়বদ্ধ, ক্রিয়াশীল এবং বৈধ সরকার
## (Accountable, responsive and legitimate government)

এমন কিছু বিষয় আছে যার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র সংবেদনশীল হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে বিষয়টি আমরা অধিক প্রত্যাশা করি তা হল শাসক গোষ্ঠীদের নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জনগণের একচ্ছত্র অধিকার। যে কোনো প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কারণ এই সিদ্ধান্তগুলো তাদের জীবনকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এমন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যা তার নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ এবং জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীল।

এই প্রশ্নটি সমাধানের পূর্বে আমাদের অন্য আরেকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, যেমন গণতান্ত্রিক সরকার কি সত্যিকার অর্থে কার্যক্ষম? এটা কি খুব ফলপ্রসূ? কিছু মানুষ মনে করে গণতান্ত্রিক সরকার খুব বেশি দক্ষ নয়। যদিও এটা সত্য যে অগণতান্ত্রিক শাসকগণ কখনোই গণসমাবেশ, আন্দোলন, সংখ্যাগুরুদের নিবেদন কিংবা জনমত নিয়ে মাথা ঘামায় না। সুতরাং অগণতান্ত্রিক শাসকগণ দ্রুত এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করতে পারে। গণতন্ত্র আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সামান্য দেরি হতে বাধ্য। একারণেই কি গণতান্ত্রিক সরকারকে অদক্ষ বলে মনে করা হয়?

চলো এবার সময়ের মূল্যমান নিয়ে আলোচনা করি। মনে করো একটি সরকার খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নাহলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিপরীতে গণতান্ত্রিক সরকার নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে বেশ কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং এর জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে বাধ্য হয়। তবে যেহেতু নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সেহেতু তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় ও সার্বিকভাবে ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং গণতন্ত্রে সময়ের অপচয় বেশি হলেও তার কার্যকারিতা ও মূল্যমান অধিক।

এখন অন্য একটি দিক লক্ষ করা যাক।

*সরকারি গোপনীয়তা*

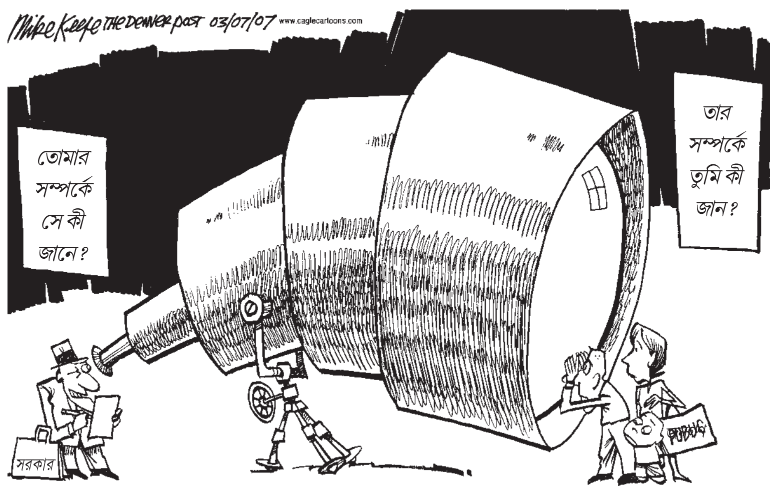


© Mike Keefe - Cagle Cartoons Inc.

গণতন্ত্র নিশ্চিত করে যে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সুতরাং কোনো নাগরিক চাইলে এটা জানতে পারে যে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তটি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নেওয়া হয়েছে কিনা? সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যাচাই করার অধিকার এবং অবলম্বন উভয়ই একজন নাগরিকের রয়েছে। আর এটাকেই স্বচ্ছতা বলা হয়। অগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার এবিষয়টি কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং যখনই আমরা গণতন্ত্রের কার্যকারিতা যাচাই করার চেষ্টা করব তখন নিশ্চয় দেখব যে প্রতিষ্ঠিত সরকার সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কিনা। এটাও জানতে চাইব যে জনগণের প্রতি এই সরকার কতটুকু দায়বদ্ধ। আমরা এটাও আশা করতে পারি যে গণতান্ত্রিক সরকার এমন কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো নির্মাণ করবে যার মাধ্যমে জনগণ সরকারকে দায়বদ্ধ হতে বাধ্য করবে। তাছাড়া এমন ব্যবস্থাও থাকাবে যেখানে জনগণ প্রয়োজনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করবে।

এই প্রত্যাশাগুলোর ভিত্তিতে তুমি যদি গণতন্ত্রের কার্যকারিতাকে পরিমাপ করতে চাও তাহলে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান ও বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেমন— সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিয়মিত নির্বাচন; দেশ পরিচালনার বৃহত্তর নীতি

*ভাবতে পার কীভাবে সরকার তুমি ও তোমার পরিবার সম্পর্কে জানে (উদাহরণস্বরূপ সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র এবং রেশন কার্ড)? কী কী তথ্য ও উৎসের ভিত্তিতে তুমি সরকার সম্পর্কে জান?*

সুতরাং, গণতন্ত্রই হল গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো সফলতা। এতসব মানসিক কসরতের পরে আমরা এটাই কি আবিষ্কার করেছি?

ও আইনের উপর উন্মুক্ত ও গণবিতর্ক; এবং সরকার ও তার কর্মপ্রণালী সম্পর্কে জনগণের তথ্য অনুসন্ধানের অধিকার ইত্যাদি। উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রেক্ষাপটে সরকারের প্রকৃত কর্মপ্রণালী একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করে। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিয়মিত নির্বাচন করার এবং নীতি প্রণয়ন বিষয়ে উন্মুক্ত গণবিতর্কের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারগুলো এখন পর্যন্ত যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচন ব্যবস্থায় সমাজস্থ সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে গণবিতর্কের সম্মুখীন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। আবার গণতান্ত্রিক সরকারগুলো নিজেদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য সমূহ নাগরিকদের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও কিছুটা অসফল। তবে সর্বোপরি যেটা বলা যায়, তাহল কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে অনেক উত্তম।

প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের কাছে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা হল এই যে, সে এমন এক সরকার ব্যবস্থা উপহার দেবে যা হবে দুর্নীতিমুক্ত এবং জনগণের চাহিদাও প্রয়োজনের অন্যতম বিকল্প। এই দুটি ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের সফলতা খুব বেশি আকর্ষণীয় হতে পারেনি। গণতান্ত্রিক সরকার প্রায়ই জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না, এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দাবিগুলো অবহেলা করে। জীবনের সাথে সম্পৃক্ত দুর্নীতির প্রাত্যহিক ঘটনাগুলো আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে গণতন্ত্র এসকল সামাজিক ব্যধি থেকে মুক্ত নয়। একই সময় এটাও দেখা যায় যে অগণতান্ত্রিক দেশগুলোও এর সাথে কম দুর্নতি পরায়ণ নয়। অথবা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীলও নয়।

তবে একটি দিক থেকে গণতান্ত্রিক সরকার অন্যান্য সরকার ব্যবস্থা থেকে অবশ্যই অনেক বেশি ভালো। কারণ এটি একটি বৈধ সরকার। হতে পারে এই সরকার ধীরগতি সম্পন্ন, অনেকটাই অদক্ষ, সবসময় পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট কিংবা প্রয়োজনের প্রতি তাৎক্ষণিক ক্রিয়াশীল নয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার হল মানুষের সরকার। যার ফলে বিশ্বব্যাপী এই সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সর্বজনীনভাবে সমাদৃত। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে সমর্থিত অনেক অগণতান্ত্রিক দেশেও এর প্রবল সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জনগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা হল যে তারা তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হবে। তারা বিশ্বাস করে গণতন্ত্রই তাদের দেশের জন্য আদর্শ শাসন ব্যবস্থা। একথা অনস্বীকার্য গণতন্ত্র নিজেই নিজের জনপ্রিয় ভিত্তি কিংবা সমর্থন সৃষ্টিও বিস্তারে দারুণভাবে সক্ষম।

পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য সব দেশেই স্বৈরতন্ত্রের তুলনায় গণতন্ত্রকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মন্তব্যগুলোর যে- কোনো একটিকে যারা সমর্থন করেন।

| | বাংলাদেশ | ভারত | নেপাল | পাকিস্থান | শ্রীলঙ্কা |
|---|---|---|---|---|---|
| গণতন্ত্রেরই অগ্রাধিকার | ৬৯ | ৭০ | ৬২ | ৩৭ | ৭১ |
| কখনো কখনো স্বৈরতন্ত্র ভালো | ৬ | ৯ | ১০ | ১৪ | ১১ |
| আমাদের কাছে কোনোটাই গুরুত্বপূর্ণ নয় | ২৫ | ২১ | ২৮ | ৪৯ | ১৮ |

**অল্প সংখ্যক লোক তাদের দেশে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান।**

তোমার দেশের জন্য গণতন্ত্র কতটুকু কার্যকর হবে?

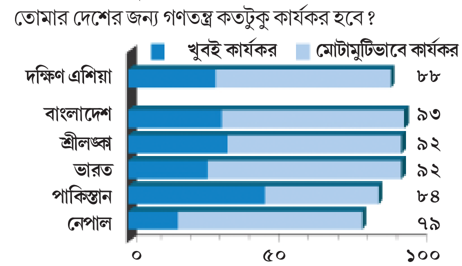


**গণতন্ত্রের প্রতি প্রবল সমর্থন**

জনগণ নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হবেন— মন্তব্যটি যারা সমর্থন করেন।

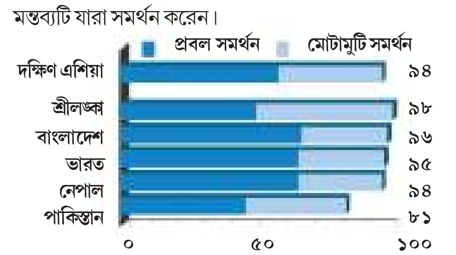


**উৎস :** Source: SDSA Team, *State of Democracy in South Asia*, Delhi: Oxford University Press, 2007

## অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন (Economic growth and development)

যদি আশা করা হয় যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভালো সরকার উপহার দেবে, তাহলে এটা আশা করা ঠিক হবেনা যে তারা দেশের উন্নয়নও সুনিশ্চিত করবে। বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে উন্নয়নের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি এর পেছনে অনেক প্রমাণ রয়েছে।

1950 থেকে 2000 সাল পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বছর সময়ের তুলনা করলে তুমি দেখতে পাবে যে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা থেকে একটু ভালো অবস্থানে রয়েছে। অধিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। কিন্তু এই একটি কারণে আমরা গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা। তুমি হয়তো ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকগুলো কারণ বা উপকরণের উপর নির্ভরশীল। যেমন দেশের জনসংখ্যার পরিমাণ, বৈশ্বিক অবস্থা, অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা, দেশ দ্বারা গৃহীত অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো ইত্যাদি। স্বৈরতান্ত্রিক দেশ, গণতান্ত্রিক দেশ কিংবা স্বল্প উন্নত দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার প্রায় উপেক্ষা করার মত। সর্বোপরি আমরা এটাও বলতে পারি না যে গণতন্ত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়। তবে আমরা এটা অবশ্যই আশা করতে পারি যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গণতান্ত্রিক দেশগুলো স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলোর চেয়ে খুব পিছিয়েও থাকবে না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকলেও অন্যান্য অনেক ইতিবাচক কারণে স্বৈরতন্ত্রের তুলনায় গণতন্ত্রকেই আমাদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

**এই পৃষ্ঠায় এবং পরের তিনটি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রগুলো আমাদেরকে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার ব্যবধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অর্জনগুলো কি সমতার ভিত্তিতে বন্টিত হওয়া উচিত নয়? দরিদ্র জনগণ রাষ্ট্রের মধ্যে কীভাবে তাদের ন্যায্য অধিকারের কথা বলবে? দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো কীভাবে বৈশ্বিক সম্পত্তিতে নিজেদের প্রাপ্য ও অংশীদারিত্ব বুঝে নিতে পারে?**

***ধনীর শক্তি সঞ্চয়***

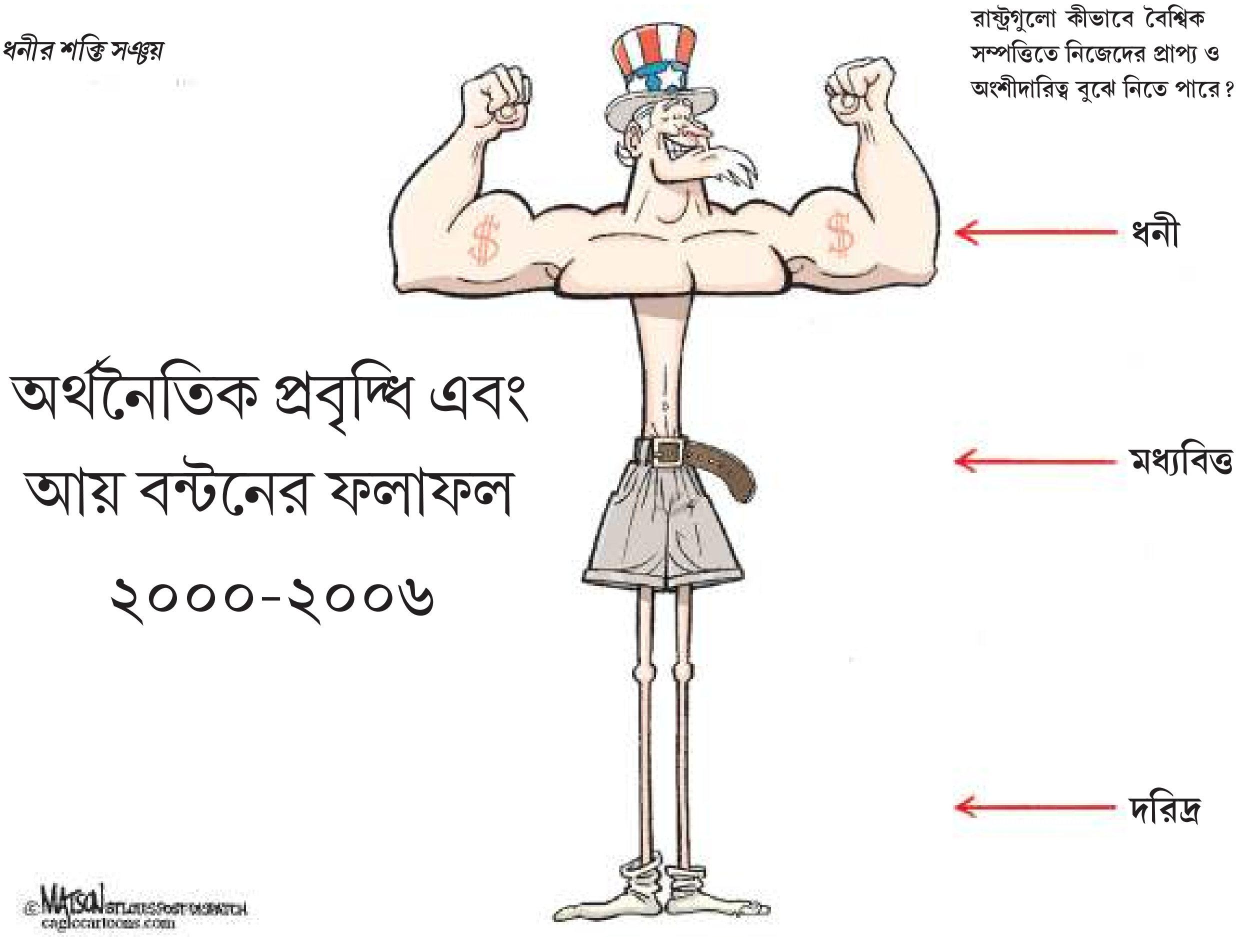


© RJ Matson - Cagle Cartoons Inc.

# গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক পরিণাম (Economic outcomes of democracy)

গণতন্ত্রের স্বপক্ষে যুক্তিগুলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়। এটাই হওয়া উচিত, কারণ গণতন্ত্র আমাদের অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধকে প্রতিপালন করে। এ সম্পর্কে অনেক বিতর্কও হয়, যেগুলোর কোনো সহজ সমাধান নেই। কিন্তু গণতন্ত্র সম্পর্কিত কিছু বিতর্ক, তথ্য এবং বাস্তব ঘটনার উদাহরণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে সমাপ্ত হতে পারে। গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক পরিণাম— এই বিষয়ে বিতর্কটি হল এর উদাহরণ। দীর্ঘ বছর ধরে বিদ্যার্থীরা গণতন্ত্রের সাথে অর্থনৈতিক অসমতা ও বিকাশের কি সম্পর্ক রয়েছে তার অনুসন্ধানে নানাহ প্রমাণাদি জোগাড় করে আসছে। নিম্নোক্ত সারণি এবং ব্যঙ্গ চিত্রটি এই ধরনের কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করবে।

***দরিদ্র শিশু***

© Jimmy Margulies - Cagle Cartoons Inc.

- প্রথম সারণিটি দেখাবে যে সামগ্রিকভাবে স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গড়ে এই একটু ভালো অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু দরিদ্র দেশগুলোকে তুলনা করলে এই অবস্থার কোনো গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।
- দ্বিতীয় সারণিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বৈষম্যের মাত্রা অতি বেশি। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে মাত্র 20 শতাংশ বিত্তশালী লোক দেশের 60 শতাংশ জাতীয় আয় ভোগ করে। মাত্র 3 শতাংশ জাতীয় আয় 20 শতাংশ দরিদ্র লোকের জন্য বরাদ্দ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে ডেনমার্ক এবং হাঙ্গোরির মত দেশগুলো অনেক উন্নত।
- ব্যঙ্গ চিত্রটিতে তুমি দেখবে যে দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা প্রায়ই সুযোগ-সুবিধা জনিত বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়।

**অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সম্পদের সুষম বন্টনের প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভালোভাবে যাচাই করার পর গণতন্ত্র সম্পর্কে তোমার রায় কী হবে?**

### সারণি-1

**বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার 1950-2000**

| রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার ধরণ | গড় প্রবৃদ্ধির হার |
|---|---|
| সকল গণতান্ত্রিক দেশ | ৩.৯৫ |
| সকল স্বৈরতান্ত্রিক দেশ | ৪.৪২ |
| স্বৈরতন্ত্র শাসিত দরিদ্র দেশগুলো | ৪.৩৪ |
| গণতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত দরিদ্র দেশগুলো | ৪.২৮ |

*উৎস*: A Przeworski, M E Alvarez, J A Cheibub and F Limongi, *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990.* Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

### সারণি-2

**নির্বাচিত কিছু দেশের আয়জনিত বৈষম্য**

| দেশের নাম | জাতীয় আয়ের অংশীদারিত্বের শতকরা হার | |
|---|---|---|
| | ২০ % উচ্চবৃত্ত | ২০ % নিম্নবৃত্ত |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৬৪.৮ | ২.৯ |
| ব্রাজিল | ৬৩.০ | ২.৬ |
| রাশিয়া | ৫৩.৭ | ৪.৪ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৫০.০ | ৪.০ |
| যুক্তরাজ্য | ৪৫.০ | ৬.০ |
| ডেনমার্ক | ৩৪.৫ | ৯.৬ |
| হাঙ্গোরি | ৩৪.৪ | ১০.০ |

## দারিদ্রতা ও বৈষম্যকরণ (Reduction of inequality and poverty)

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি উন্নয়নের চেয়েও বেশি প্রত্যাশা করা হয় যাতে সমাজ থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হয়। এমন কি যখন একটি দেশ অর্থনৈতিক সফলতা অর্জন করে তখন কি সেই দেশে সম্পদের সুষম বণ্টন হয়, যেখানে ধনী-দরিদ্র সকলেই নিজেদের অংশীদারিত্ব খুঁজে পায় এবং সকলে মিলে উন্নততর জীবন-যাপন করে, গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে বৈষম্যও কি বৃদ্ধি পাচ্ছে? অথবা গণতন্ত্র কি সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বন্টন সুনিশ্চিত করে?

***দরিদ্রের দাবি***

© Ares - *Best of Latin America*, Cagle Cartoons Inc.

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে। প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা স্বীকৃত। সমতার ভিত্তিতে সকল ব্যক্তিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিয়ে আসার সমান্তরালে আমরা তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যও লক্ষ করি। মাত্র কিছু সংখ্যক অতিবিত্তশালী মানুষ দেশের আয় এবং সম্পদের বিশাল এবং সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গতি পূর্ণ অংশীদারিত্ব উপভোগ করে। শুধু তাই নয়, এই অবস্থা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের সবচেয়ে নিম্নবিত্তশালি জনগণের জীবন অতি সামান্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাদের আয়ের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কখনো কখনো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণও তাদের কাছে প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে।

প্রকৃত জীবনে এধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে গণতন্ত্র এখনো পর্যন্ত খুব বেশি একটা সফলতা অর্জনে করতে পারেনি। নবম শ্রেণির অর্থনীতির পাঠ্য বইতে তুমি ইতিমধ্যেই ভারতের দারিদ্র্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ। বিশাল সংখ্যক দরিদ্র জনগণ এখন আমাদের ভোটার এবং কোনো দলই তাদের এই ভোটগুলো পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। যদিও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার এসকল দরিদ্র মানুষের সমস্যাগুলো নিরসনে সচেষ্ট হয় না। কোনো কোনো দেশে এই অবস্থা আরও চরম আকার নিয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। অন্যান্য অনেক দরদ্রি দেশের বেশিরভাগ জনগণ উন্নত বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রদত্ত খাদ্য এবং সহায়তার উপর নির্ভরশীল।

গণতন্ত্র হল সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসন। সমাজে দরিদ্ররাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। সুতরাং গণতন্ত্র হওয়া উচিত দরিদ্রের দ্বারা শাসন ব্যবস্থা, ব্যাপারটি এমন কেন হচ্ছে না?

*বিশ্বের সম্পদ মুষ্ঠিমেয় লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত*

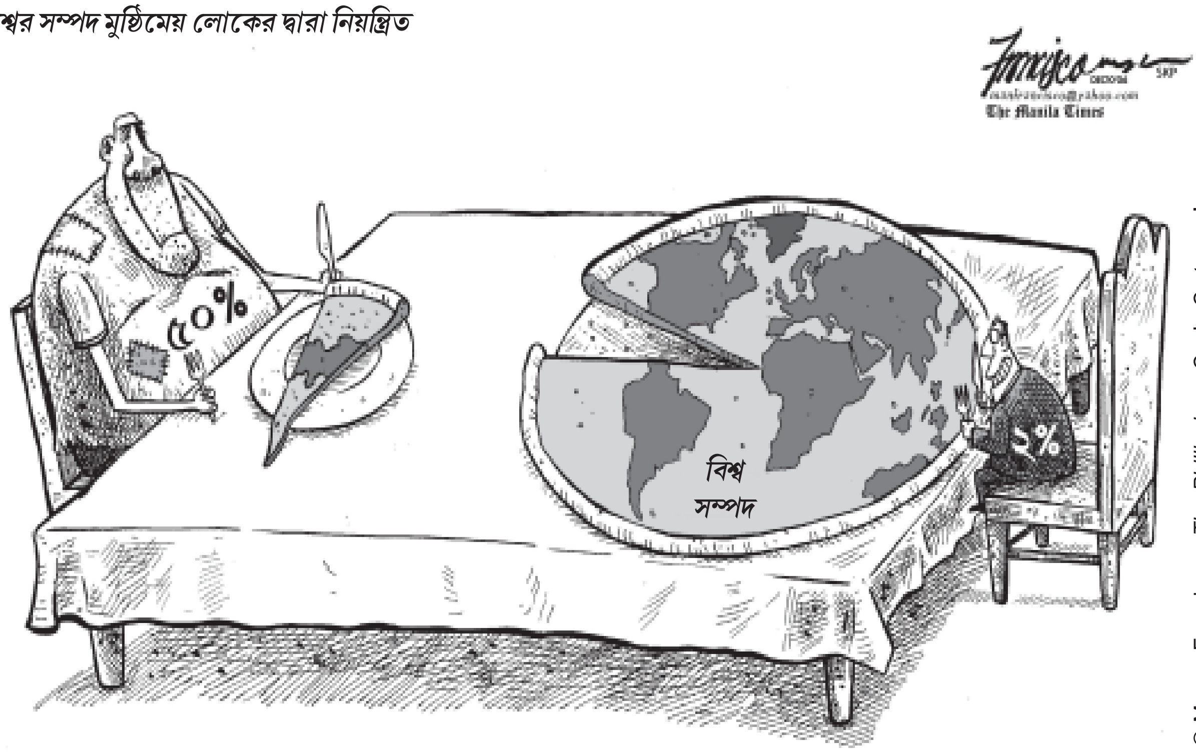


© Manny Francisco - *The Phillippines*, Cagle Cartoons Inc.

## সামাজিক বৈচিত্রের সমন্বয় (Accommodation of social diversity)

> যা তুমি বলতে চাইছ তাহল গণতন্ত্র নিশ্চয়তা দেয় যে, এই ব্যবস্থায় জনগণ পরস্পরকে কঠিনভাবে আঘাত করে না, এটাই সৌহার্দ্য কিংবা সম্প্রীতি নয়। আমরা কি এতেই খুশি থাকব?

গণতন্ত্র কি নাগরিকদের জন্য শান্তি ও সুসংহত জীবন নিশ্চিত করে? একটি স্বাভাবিক প্রত্যাশা হল যে গণতন্ত্র সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি গণতন্ত্র কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক বৈচিত্রের মাঝে সমন্বয় সাধন করে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কীভাবে বেলজিয়াম বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চলমান মতভেদগুলোকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করেছে। নিজেদের মধ্যে যে-কোনো প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট নিয়ম প্রক্রিয়া তৈরি করে। এর মাধ্যমে যে-কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা বৃহত্তর হিংসা কিংবা বিক্ষোভ রূপান্তরিত হয়।

কোনো সমাজেই বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে চলমান পার্থক্যগুলো চিরতরে নিরসন করতে পারে না। তবে আমরা অবশ্যই এই পার্থক্য কিংবা বৈচিত্র্যগুলোকে সম্মান জানাতে পারি এবং এমন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি যার মাধ্যমে এই সমস্যার নিরসন করা যায়। আর এটা করার জন্য গণতন্ত্রই হল সর্বোৎকৃষ্ট পথ। অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একচোখানীতি গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বৈচিত্রগুলোকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক সরকারের সবচেয়ে বড়ো ইতিবাচক দিক হল যে, এর ভিতর সামাজিক পার্থক্য বিভাজন এবং সংঘর্ষ মোকাবেলার সামর্থ রয়েছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই প্রত্যাশায় সফল হওয়ার জন্য দুটি পূর্ব শর্ত রয়েছে :

- এটা অনুধাবন করা অপরিহার্য যে সংখ্যাগুরু শাসনই শুধুমাত্র গণতন্ত্র নয়। এখানে সংখ্যাগুরুদেরকে সংখ্যালঘুদের সাথে নিয়ে কাজ করতে হয়। যাতে সরকারের সার্বজনীন ভাবমূর্তি বজায় থাকে। সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু অভিমত কোনোটাই এখানে স্থায়ী নয়।
- তাছাড়া সংখ্যাগুরুর শাসনের অর্থ এই নয় যে এটা সংখ্যাগুরু ধর্মীয় জাতি, ভাষাগোষ্ঠী ইত্যাদি মানুষের দ্বারা পরিচালিত সরকার। সংখ্যাগুরুদের দ্বারা পরিচালিত শাসনের মূল অর্থ

হল প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিংবা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মানুষ মিলেমিশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করে। গণতন্ত্র ততক্ষণই গণতন্ত্র থাকে যতক্ষণ প্রত্যেক নাগরিক কোনো না কোনো প্রেক্ষাপটে নিজেকে সংখ্যা গরিষ্ঠতার অংশ হিসাবে ভাবে। কোনো ব্যক্তি যখন জন্মের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ অবকাঠামোর অংশীদারিত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখনই সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কখনোই বৈচিত্র্যময় মানুষ এবং জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ক হতে পারে না।

শত্রু

শুভেচ্ছা

*উল্লেখিত দুটি ব্যঙ্গ চিত্র সামাজিক বিভাজনের উপর গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিভিন্ন প্রভাবকে চিত্রায়িত করেছে। প্রত্যেক চিত্র থেকে একটি করে উদাহরণ নিয়ে দুটি ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিণতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।*

© Ares - *Best of Latin America*, Cagle Cartoons Inc.

## নাগরিকদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা (Dignity and freedom of the citizens)

ব্যক্তি স্বাধানতা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের স্থান অন্যান্য সরকার ব্যবস্থার তুলনায় অনেক উর্ধ্বে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পাশের মানুষটি থেকে সম্মান পেতে চায়। যখনই কেউ মনে করে যে তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না তখনই ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদের সূত্রপাত হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতি সংবেদনশীলতাই হল গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। নীতিগতভাবে হলেও সারা বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক সমাজ এই সত্যটি মেনে নিয়েছে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এবিষয়টি প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে। যেসকল সমাজ সুদীর্ঘ কাল ধরে আধিপত্যবাদ ও অধীনস্ততার নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের জন্য সমাজস্থ সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা মোটেই সহজ নয়।

নারীদের মার্যাদার বিষয়টি মনে করো। বিশ্বের বেশিরভাগ সমাজই ঐতিহাসিকভাবে পুরুষ শাসিত। নারীদের দ্বারা দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে বর্তমান সমাজে তাদের জন্য এমন এক সংবেদনশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নারীদের প্রতি মর্যাদা এবং

*আমি আমার বোর্ড পরীক্ষা নিয়েই চিন্তিত থাকি। অথচ গণতন্ত্রকে অনেক পরীক্ষা ও লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর সম্মুখীন হতে হয়।*

সমতার বিষয়টিকে গণতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে মনে করা হয়। তার অর্থ এই নয় যে নারীদের মর্যাদা সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই নীতিটির স্বীকৃতির ফলে আইনগত ও নীতিগতভাবে অগ্রহণযোগ্য কোনো কাজের বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম অনেকটা সহজ হয়েছে। একটি অগণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার নীতি সমূহের কোনো আইনগত কিংবা নীতিগত কোনো ভিত্তি থাকে না। ফলে ঐ সমাজ ব্যবস্থায় অগ্রহণযোগ্য কোনো নীতির বিরুদ্ধে আইনি কিংবা নীতিগত সংগ্রাম করা যায় না। জাতিগত বৈষম্যতার ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে সত্য। ভারতীয় গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সুবিধা বঞ্চিত ও বৈষম্য পীড়িত জাতিগোষ্ঠীর সমমর্যাদা ও সমান সুবিধা পাওয়ার দাবিগুলোকে শক্তিশালী করেছে। যদিও ভারতবর্ষে এখনো জাতিভিত্তিক বৈষম্য ও নিপীড়ণের উদাহরণ রয়েছে, কিন্তু এদের পেছনে কেনো আইনগত ও নীতিগত ভিত্তি বা সমর্থন নেই এবং সম্ভবত এই স্বাভাবিক স্বীকৃতিটুকুই একজন সাধারণ নাগরিককে তার গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি মর্যাদাশীল করে তুলেছে।

গণতন্ত্রের প্রতি প্রত্যাশাই একটি গণতান্ত্রিক সমাজকে পরীক্ষা করার উপকরণ হিসাবে কাজ করে। যে ব্যাপারটি গণতন্ত্রকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র করে তুলেছে তাহল এর সম্পর্কে গবেষণা কখনো শেষ হয় না। গণতন্ত্র যখনিই একটি পরীক্ষায় পাশ করে তখন তার ভিতরেই অন্য আরেকটি পরীক্ষা জন্ম নেয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা পাওয়ার পর জনগণ আরও বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে এবং এর জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে চায়। এজন্যই যখন আমরা নাগরিকদের গণতন্ত্র কীভাবে কাজ করে এ বিষয়ে প্রশ্ন করি তখন তারা অনেক অভিযোগ এবং আরও বেশি প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হন। আসলে যে বিষয়ে জনগণ অভিযোগ করে সেই বিষয়টি গণতন্ত্রের সফলতার মূল মন্ত্র হয়ে ওঠে। কারণ এটা দ্বারা বোঝা যায় যে, জনগণ নিজেদের মধ্যে এমন সামর্থ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে যার মাধ্যমে তারা এই ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী উচ্চ থেকে সর্বোচ্চ ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং তাদের প্রয়োজনীয় দাবি উপস্থাপন করতে পারে। গণতন্ত্র সম্পর্কে গণঅসন্তোষের প্রকাশই আসলে গণতন্ত্র নামক প্রকল্পেরই একধরনের সফলতা। কারণ এর মাধ্যমে জনগণ প্রজা থেকে নাগরিকে রূপান্তরিত হয়। বেশিরভাগ ব্যক্তিই বর্তমানে বিশ্বাস করে যে তাদের ভোটাধিকার সরকার পরিচালনার দিক নির্দেশনায় পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যা তাদের স্বার্থের অনুকূলে প্রবাহিত হবে।

চলো আলোচনা করি

***রোজা পার্ক এখনো উৎসাহ দিয়ে চলেছেন***

© Pat Bagley - Cagle Cartoons Inc.

*উপরে উল্লেখিত ব্যঙ্গ চিত্রটি এই ভাগে বর্ণিত একটি দিকের (পয়েন্ট) প্রতি ইশারা করছে (নাগরিকদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা)। এখানে উল্লেখিত ঐ সকল বক্তব্যগুলোর নীচে রেখা টানো যা তোমার মতে এই ব্যঙ্গ চিত্রটি বা লেখচিত্রটির সাথে যুক্ত করা যায়।*

**প্রদত্ত ভোটের কার্যকারিতার উপর বিশ্বাসের উপযোগিতাও গাণিতিক প্রকাশ।**

*যারা মনে করেন যে তাদের ভোট দ্বারা পরিবর্তন সাধিত হয়।*

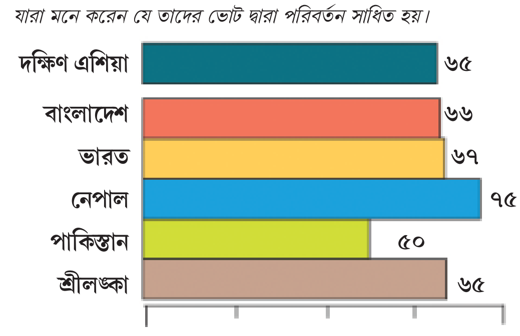


*উৎস* : SDSA Team, *State of Democracy in South Asia*, Delhi: Oxford University Press, 2007.

# অনুশীলনী

1. কীভাবে গণতন্ত্র একটি ক্রিয়াশীল, দায়বদ্ধ এবং বৈধ সরকার সৃষ্টি করতে পারে?
2. যে-কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক বৈচিত্র্যগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের শর্তগুলো কী কী?
3. নীচের বক্তব্যগুলোর পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি দাও :
   - শিল্পোন্নত বা ধনী দেশগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ধনী হওয়ার জন্য দরিদ্র দেশগুলোর প্রয়োজন একনায়কতন্ত্র।
   - গণতন্ত্র বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের মধ্যে আয় বৈষম্য হ্রাস করতে পারে না।
   - দরিদ্র দেশের সরকারগুলোর উচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি থেকে কম ব্যয় করা এবং শিল্প ও পরিকাঠামো খাতে অধিক ব্যয় করা।
   - গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল নাগরিকেরই একটি করে ভোট থাকে, এর অর্থ হল ঐ সমাজে কোনো ধরণের আধিপত্য ও বিবাদ নেই।
4. নীচের বর্ণনা থেকে গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত কর। নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য কোনো বিকল্প নীতি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দাও :
   - উড়িষ্যা রাজ্যের একটি মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে দলিত এবং অদলিত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক প্রবেশ দ্বারের ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ আদালতের একটি নির্দেশিকা অনুসারে সকলের জন্য একটি প্রবেশ দ্বারের মধ্য দিয়েই মন্দিরের অভ্যন্তরে গমনের অনুমতি দেওয়া হল।
   - ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর পরিমাণে কৃষক আত্মহত্যা করছে।
   - গান্ডোয়ারায় জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ কর্তৃক সম্মুখ মোকাবিলায় তিনজন সাধারণ নাগরিককে হত্যার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
5. গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নীচের কোন্ ধারণাগুলো সত্য— অত্যন্ত সফলভাবে গণতন্ত্র দূর করেছে :

   A. মানুষে মানুষে বিবাদ।

   B. জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য।

   C. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলোকে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে সে সুসম্পর্কিত মত পার্থক্য।

   D. রাজনৈতিক বৈষম্যের ধারণা।
6. গণতন্ত্রকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নীচের কোনটি বেমানান তা চিহ্নিত করো। গণতন্ত্রকে এটা নিশ্চিত করতে হবে :

   A. সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন।

   B. ব্যক্তি মার্যাদা।

   C. সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের শাসন।

   D. আইনের চোখে সমতা।

## অনুশীলনী

7. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য-এ বিষয়ের উপর কিছু গবেষণা প্রমাণ করে যে :

   A. গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন একসাথে চলতে পারে।

   B. গণতন্ত্রেও বৈষম্য বর্তমান।

   C. একনায়কতন্ত্রে বৈষম্য থাকে না।

   D. গণতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্র উত্তম।

8. নীচের রচনাংশটি পড়ো :

   *নান্নু একজন দিনমজুর। সে পূর্ব দিল্লির বস্তি এলাকার অন্তর্গত ওয়েলকাম মজদুর কলোনিতে বসবাস করে। সে তার পারিবারিক রেশন কার্ডটি হারিয়ে ফেলে এবং ২০০৪ সালে জানুয়ারি মাসে ১টি নকল রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করে। পরবর্তী তিনমাসে সে বহুবার স্থানীয় খাদ্য ও গণবন্টন দফতরে যাতায়াত করে। কিন্তু আধিকারিক এবং করণিকগণ তার দিকে ফিরেও তাকাত না, একা একা বসে অন্য কাজ করত। অথবা তাকে তার আবেদনপত্রের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও কোনো কিছু জানানোর প্রয়োজনবোধ করত না। উপায়ান্তর না দেখে তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় সে নতুন একটি আবেদন করে যাতে তার পূর্ব আবেদনের প্রাত্যহিক অবস্থান তাকে জানানো হয়, তার আবেদনপত্রের উপর কাজ করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকগণের নাম এবং নিষ্ক্রিয় থাকার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কেও তাকে জানাতে বলা হয়েছে। তথ্য জানার অধিকার আইনের ভিত্তিতে আবেদন জানানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই খাদ্য দপ্তর থেকে এক আধিককারিক নান্নুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হয়ে জানান যে তার নকল রেশন কার্ড তৈরি করা আছে। সে যেন দপ্তর থেকে সংগ্রহ করে নেয়। পরেরদিন কার্ড সংগ্রহ করতে গেলে ঐ সার্কেলের প্রধান তথা খাদ্য ও বন্টন আধিকারিক নান্নুকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। আধিকারিক তাকে চায়ের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুরোধ করেন যে যেহেতু তার দাবি ইতোমধ্যে পূরণ হয়ে গেছে তাই সে যেন তথ্য অধিকার আইনের আওতায় করা আবেদনপত্রটি প্রত্যাহার করে নেয়।*

   নান্নুর উদাহরণ কী প্রমাণ করে? নান্নুর কর্মতৎপরতা আধিকারিকদের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে? তোমার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করো যে তারা যখন সরকারি আধিকারিকদের সাথে কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে তখন তাদের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল।

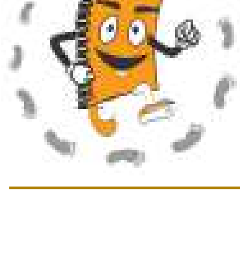

# গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা সমূহ

# Challenges to Democracy

অধ্যায়—৮

## সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Overview)

এই সমাপনী অধ্যায়টির মাধ্যমে বিগত দু'বছর ধরে তোমরা যা শিখেছ তার উপরে একটি উপসংহার টানা হয়েছে। যাতে তোমরা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক প্রশ্নগুলো আলোকপাত করতে পার। যেমন- আমাদের কিংবা অন্যকোনো দেশের রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থা কী কী বাঁধা সমূহের সম্মুখীন হচ্ছে? রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্করণে কী কী করা প্রয়োজন? আমাদের দেশে চলমান গণতন্ত্র কীভাবে আরো জনমুখী ও ফলপ্রসূ হতে পারে? এই অধ্যায়টি থেকে এসকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। এটি শুধুমাত্র এমন কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দেবে যার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সমস্যা ও তার সংস্কার সম্পর্কে আমরা প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারব। এটি তোমাদেরকে উপরোক্ত সমস্যাগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে তোমাদের নিজস্ব মতামত গঠনে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে  তোমরা গণতন্ত্রকে নিজের মত করে সংজ্ঞায়িত করতে পারবে এবং সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে বের করতে পারবে।

# গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্যা ও চিন্তন (Thinking about challenges)

তোমরা কি নবম শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ্যবইটির প্রথম অধ্যায়ের কথা স্মরণ করতে পার? ঐখানে গত একশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গণতন্ত্রের বিস্মৃতি ও পরিক্রমা সম্পর্কে জানতে পেরেছ। ওই অধ্যায়টি আমাদের এই উপলব্ধিকে সুনিশ্চিত করেছে যে গণতন্ত্র হল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী সরকারি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত ভয়ানক কোনো বিরোধীতা কিংবা সমস্যা মোকাবেলা করেনি। যদিও গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের আবিষ্কার একটু ভিন্ন কথা বলে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার নিজের প্রতিশ্রুতিপালনে ব্যর্থ। গণতন্ত্রের সম্মুখে বিশাল কোনো বাঁধা না থাকলেও সে সম্পূর্ণ সমস্যা মুক্ত নয়।

অন্য একটি মতবাদ থেকে আমরা এটাও জানতে পারি, গণতন্ত্রের যাত্রাপথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বড় বড় বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। বাঁধা শুধুমাত্র একটি সাধারণ সমস্যা নয়। সাধারণত এমন সমস্যাগুলোকেই আমরা 'বাঁধা' বলি যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যার সমাধান সম্ভব। যে কোনো ধরনের বাঁধাই এমন একটি সমস্যা, যে নিজের মধ্যেই সমাধান রচনা করে। একবার সেই বাঁধা অতিক্রম করতে পারলেই আমরা পূর্বের তুলনায় কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পারি।

বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন। তোমাদের পাঠ্যবই-এ অন্তর্ভুক্ত ২০০০ সালের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মানচিত্রের কথা কি মনে করতে পার? বিশ্বের প্রায় এক চতুর্থাংশ দেশ এখনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে। বিশ্বের এই সকল দেশগুলোর গণতন্ত্র শোচনীয় সমস্যার সম্মুখীন। এই সকল দেশগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার এবং নতুন গণতান্ত্রিক সরকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই মৌলিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হচ্ছে চলমান অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো, সরকারকে সামরিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা এবং দেশকে সার্বভৌম ও কার্যকর রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

আবার অনেক প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো গণতন্ত্রের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। এসকল বাঁধার অন্যতম হল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মৌলিক নীতি সমূহকে সমগ্র অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা। তাছাড়া স্থানীয় সরকারগুলোর হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সকল স্তরে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের প্রসার, নারী ও সংখ্যালঘু শ্রেণির প্রতি বিশেষ সংবেদনশীলতা ইত্যাদিও উল্লেখিত সমস্যাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হল সাধারণ থেকে অতিসাধারণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষমতাও বিকেন্দ্রীভূত করা। ভারত, আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই ধরনের সমস্যা এখনো মোকাবিলা করছে।

এক্ষেত্রে তৃতীয় বড় সমস্যাটি হল রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করা। এই সমস্যাটি পৃথিবীর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কোনো না কোনো ভাবে মোকাবিলা করছে। অর্থাৎ সমাজে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এবং সর্বস্তরে গণতন্ত্রের চর্চা করা। এটা এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে জনগণ উপলব্ধি করতে পারে যে, তাদের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হচ্ছে। যেহেতু বিভিন্ন সমাজের মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন ভিন্ন আশা পোষণ করে সেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই সমস্যাগুলোর প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণভাবে কিছু মানুষের প্রত্যাশা হল ঐসকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা, যেগুলোতে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত হয়। এই ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ধনী এবং প্রভাবশালীদের ভূমিকা হ্রাস করা।

এই বইটির প্রথম দিকে এবং নবম শ্রেণির পাঠ্যবইতে বিভিন্ন উদাহরণ এবং ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই সমস্যা গুলোর ব্যাপারে আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি। চলো আমাদের গণতান্ত্রিক জীবনের যাত্রাপথে বিশেষ মাইলফলকের দিকে ফিরে যাই। এর মাধ্যমে আমরা স্মৃতি শক্তিকে উজ্জীবিত করি এবং এই যাত্রাপথের বিশেষ বাঁধা সমূহকে নিয়ে পর্যালোচনা করি।

## পৃথক প্রেক্ষাপট, পৃথক প্রতিবন্ধকতা (Different contexts, different challenges)

*নীচের প্রতিটি ব্যঙ্গাচিত্র গণতন্ত্রের একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতাকে চিত্রায়িত করে। ব্যাখ্যা করে বল যে, প্রতিবন্ধকতাটি কী। এই প্রতিবন্ধকতাটিকে পূর্বে আলোচিত যে কোনো একটি ভাবে চিহ্নিত কর।*

*মোবারক পুন:নির্বাচিত হয়েছে*

___________________________

___________________________

___________________________

*গণতন্ত্রকে দেখা*

___________________________

___________________________

___________________________

*উদার লিঙ্গা সমতা*

___________________________

___________________________

___________________________

*নির্বাচনী প্রচারে অর্থব্যয়*

___________________________

___________________________

___________________________

| ঘটনা ও প্রেক্ষাপট | এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তোমার ব্যাখ্যা |
|---|---|
| **চিলি:** জেনারেল পিনোসেট-এর সরকার ক্ষমতাচ্যুত, কিন্তু সরকারের অনেক প্রতিষ্ঠান এখনো সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। | (উদাহরণ): সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। নির্বাসন থেকে সকল রাজনৈতিক নেতাদের ডেকে এনে প্রথম বহুদলীয় নির্বাচন প্রতিষ্ঠিত হয়। |
| **পোল্যান্ড:** সলিডারিটি দলের প্রথম সফলতার পরে এখানকার সরকার সামরিক আইন জারী করে এবং সলিডারিটি দলকে নিষিদ্ধ করে। | |
| **ঘানা:** মাত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং নক্রোমা দেশটির রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। | |
| **মায়ানমার:** সুকি ১৫ বছর ধরে গৃহবন্দী, সামরিক শাসকগণ বিশ্বের স্বীকৃতিও পাচ্ছেন। | |
| **আন্তর্জাতিক সংস্থা:** মহাশক্তিধর দেশ হিসাবে আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘকে উপেক্ষা করে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। | |
| **মেক্সিকো:** ২০০০সালে পি আর আই দলের পরাজয়ের পর দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরাজিত প্রার্থীরা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করে। | |
| **চীন:** কমিউনিস্ট দল অর্থনৈতিক সংস্কার গ্রহণ করলেও রাজনৈতিক ক্ষমতায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছে। | |
| **পাকিস্থান:** জেনারেল মুসারফ গণভোটের ব্যবস্থা করেছে, তবে নির্বাচক তালিকায় দুর্নীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে। | |
| **ইরাক:** বৃহৎস্তরে জাতিগত সংঘর্ষ। কারণ নতুন সরকার সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। | |
| **দক্ষিণ আফ্রিকা:** ম্যান্ডেলা সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছে। তার উত্তরসূরি এমবেকের উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের জন্য গৃহীত কিছু সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। | |

| ঘটনা ও প্রেক্ষাপট | এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তোমার ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| **যুক্তরাষ্ট্র, গোয়েতেনামো বে:** জাতিপুঞ্জের মহাসচিব এখানে সংগঠিত ঘটনাকে আন্তর্জাতিক আইনের উলঙ্ঘন বলে বর্ণনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিক্রিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। | |
| **সৌদি আরব:** উন্মুক্ত স্থানে নারীদের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় না এবং সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। | |
| **যোগোস্লাভিয়া:** কসভো রাজ্য আলবেনিয়ান এবং সার্বিয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমবর্ধমান। যোগোস্লাভিয়া শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। | |
| **বেলজিয়াম:** প্রথম পর্যায়ের সাংবিধানিক সংশোধনের পর ডার্চ ভাষাভাষী জনগণ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা আরো বেশি স্বশাসন দাবী করছে। | |
| **শ্রীলঙ্কা:** সরকার এবং এল টি টি ই-এর মধ্যকার শান্তি আলোচনা ভেস্তে যায় এবং নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়। | |
| **আমেরিকার নাগরিক অধিকার:** এখানে কৃষ্ণাঙ্গাদেরও সমঅধিকার রয়েছে, কিন্তু সমাজে তারা এখনও দরিদ্র, কমশিক্ষিত এবং প্রান্তিক। | |
| **উত্তর আয়ারল্যাণ্ড:** গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে তবে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট গোষ্ঠী এখনো পরস্পরের বিশ্বাসভাজন হতে পারেনি। | |
| **নেপাল:** গণপরিষদ নির্বাচিত হওয়ার পথে। তরাই অঞ্চলে বিশাল বিক্ষোভ, মাওবাদীরা এখনও তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেনি। | |
| **বলিভিয়া:**মোরালেস জলের জন্য সংগ্রামের একজন অন্যতম সমর্থক এবং দেশটির প্রধানমন্ত্রী। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দেশ ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে। | |

## বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা (Different types of challenges)

তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্রতিবন্ধকতাগুলো লক্ষ করেছ, চলো এগুলোকে আমরা বৃহত্তরভাবে ভাগ করি। গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিভিন্ন উপাদানকে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি উপাদানের বিপরীতে তুমি নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলোকে যা এক বা একাধিক দেশের সাথে জড়িত, তা সাজিয়ে লেখ। অথবা তার পূর্বের অনুচ্ছেদে ব্যঙ্গাচিত্র দ্বারা প্রকাশিত সমস্যাগুলোকেও উল্লেখ করতে পার। পাশাপাশি একটি উপাদানের বিপরীতে ভারতের সাথে যুক্ত সমস্যাগুলোকেও উল্লেখ করতে পার। প্রাপ্তকিছু সমস্যা যদি নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট না হয় সেক্ষেত্রে তুমি নতুন কিছু উপাদানও তৈরি করতে পার।

| | |
|---|---|
| সাংবিধানিক পরিকল্পনা | |
| গণতান্ত্রিক অধিকার | |
| প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা | |
| নির্বাচন | |
| যুক্তরাষ্ট্রবাদ, বিকেন্দ্রীকরণ | |
| বৈচিত্রতার সমন্বয় | |
| রাজনৈতিক সংগঠন | |
| ____________ ____________ অন্য যে কোনো উপাদান | |
| ____________ ____________ অন্য যে কোনো উপাদান | |

প্রথমভাগে উল্লেখিত সমস্যাগুলোর প্রকৃতি অনুসারে আবারো ভাগ করি। এই শ্রেণি বিভাগে ভারত সম্পর্কে কমপক্ষে একটি উদাহরণ উল্লেখ কর।

| | |
|---|---|
| মৌলিক বা ভিত্তিগত প্রতিবন্ধকতা | |
| প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা | |
| শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা | |

চলো এখন শুধু ভারতকে নিয়েই ভাবি। সমকালীন ভারতীয় গণতন্ত্র যে সকল প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবিলা করছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দাও। প্রথমত পাঁচটি এধরনের সমস্যাকে চিহ্নিত কর। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এগুলোকে তালিকাভুক্ত কর। তোমার কাছে এই মুহূর্তে যে সমস্যাটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় সেটিকে ১ নম্বরে স্থান দাও এবং ক্রমানুসারে এভাবেই সাজিয়ে যাও। অগ্রাধিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে তোমার যুক্তির সপক্ষে একটি উদাহরণ দাও।

| অগ্রাধিকার | গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা | উদাহরণ | অগ্রাধিকারের সপক্ষে যুক্তি বা কারণ |
|---|---|---|---|
| ১ | | | |
| ২ | | | |
| ৩ | | | |
| ৪ | | | |
| ৫ | | | |

## রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে ভাবনা (Thinking about political reforms)

উল্লেখিত প্রতিটি প্রতিবন্ধকতারই সম্ভাব্য সমাধান আছে। সমস্যা সম্পর্কে আমরা তখনই আলোচনা করি যখন মনে করি যে এর সমাধান সম্ভব। সাধারণত যে সকল প্রস্তাব কিংবা পরামর্শ সমস্যা সমাধানকল্পে প্রদান করা হয়, সেগুলোকে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার’ বা ‘রাজনৈতিক সংস্কার’ বলা হয়। রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে আমরা এখানে কোনো তালিকা প্রস্তুত করব না, এধরনের কোনো তালিকা হয়ও না। যেহেতু বিশ্বের সবগুলো রাষ্ট্র একই ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেনা, তাই সবার জন্য অনুসরণযোগ্য একই ধরনের কোনো রাজনৈতিক সংস্কারের তালিকা প্রস্তুত করাও সম্ভব নয়। একটি যানবাহন মেরামতের জন্য আমরা এমন কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলতে পারিনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জানতে পারবনা যে, বাহনটি কোন্ মডেলের, এর মধ্যে কী কী যন্ত্র আছে, কোন যন্ত্রটি বিকল হয়েছে। অথবা এর কোন্ অংশটি অচল হয়ে পড়েছে ইত্যাদি।

তবে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আমরা কি আমাদের দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কারের কোনো তালিকা তৈরি করতে পারি? হ্যাঁ, জাতীয়স্তরে রাজনৈতিক সংস্কারের কিছু প্রস্তাব আমরা উপস্থাপন করতে পারি। কিন্তু সংস্কারজনিত সমস্যা শুধুমাত্র জাতীয়স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা থাকে যার সম্পর্কে রাজ্য কিংবা স্থানীয় স্তর থেকেই চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে হয়। তাছাড়া এধরনের কিছু সমাধান কিছুদিন পরে অপ্রাসঙ্গিকও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এগুলোর পরিবর্তে আমাদেরকে এমনকিছু সার্বজনীন নির্দেশিকার কথা মাথায় রাখতে হবে যা ভারতের রাজনৈতিক সংস্কারের উপায় উপকরণ প্রণয়ন করার সময় সহায়ক হবে।

- রাজনৈতিক সংস্কারের একটি প্রত্যাশিত পথ হল এমন কিছু নতুন আইন সৃষ্টি করা যা অপ্রয়োজনীয় কিংবা ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ করবে। তবে এই ধরনের আবেগময় চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ থাকাই ভালো। সন্দেহ নেই যে, রাজনৈতিক সংস্কারে আইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যত্নসহকারে নেওয়া প্রত্যেকটি আইনগত পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত কিংবা ভুল রাজনৈতিক চর্চাকে অনুৎসাহিত করে এবং প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু শুধুমাত্র আইনগত বা সাংবিধানিক পরিবর্তন গণতন্ত্রের সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে পারে না। এটা অনেকটাই ক্রিকেট খেলার নিয়মের মতো। যেমন- এল বি ডব্লিউজনিত নতুন সিদ্ধান্ত ক্রিকেট খেলায় নেতিবাচক ব্যাটিং-এর প্রবণতা হ্রাস করেছে। কখনো কেউ এটা চিন্তা করে না যে, শুধুমাত্র ব্যাটিং পদ্ধতির সংস্কারের ফলে ক্রিকেট খেলার সামগ্রিক উন্নয়ন হবে। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কাজটি করবে বিশেষ করে খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসকগণ। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক সংস্কারের কোনো কাজও শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল, কর্মী এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাগরিক দ্বারাও এককভাবে সম্ভব নয়।

- যেকোনো প্রকারের আইনগত সংস্কারের ক্ষেত্রে এটা খুব যত্ন সহকারে মনে রাখতে হবে যে, চলমান রাজনীতির উপর এর প্রভাব কী হবে। কখনো কখনো এর ফলাফল প্রত্যাশার বিপরীতও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অনেক রাজ্যই দুই বা ততোধিক সন্তানের পিতা-মাতাকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করেছে। এর ফলে অনেক দরিদ্র নারী-পুরুষ রাজনৈতিক সমতা ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা কখনো কাম্য নয়। সাধারণত আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা রাজনীতিতে খুব বেশি সফল হয় না। রাজনীতিবিদরা যতবেশী আইনগত সুবিধা পায় তখন তাদের মধ্যে ভালো কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সর্বোত্তম আইন হল যা গণতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে জনগণের ক্ষমতা সুনিশ্চিত করে। তথ্য জানার অধিকার আইন এমন একটি ভালো উদাহরণ যা সরকারের গৃহীত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর নিতে পারে এবং এর মাধ্যমে তারা গণতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে ভূমিকা নিতে পারে। এধরনের আইন দুর্নীতি হ্রাসে সহায়ক এবং দুর্নীতি রোধক চলমান আইনগুলোর সম্পূরক হিসাবে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি প্রকৃত অপরাধীদের দণ্ডিতও করতে পারে।

- গণতান্ত্রিক সংস্কার মূলত সুস্থ রাজনৈতিক অভ্যাস গঠনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। সুতরাং রাজনৈতিক সংস্কার এমনভাবে হওয়া উচিত যা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে। রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, রাজনীতিতে সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মান বৃদ্ধিতে পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

- রাজনৈতিক সংস্কারের নিমিত্তে গৃহীত কোনো প্রস্তাব শুধুমাত্র সমস্যার উত্তম সমাধানের কথাই বলবেনা, বরং কারা এ প্রস্তাব কার্যকর করবে এবং কীভাবে করবে সে ব্যাপারেও আলোকপাত করবে, এটা ভাবা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যে, আইনসভা এমন আইন প্রণয়ন করবে যা সকল রাজনৈতিক দল কিংবা সংসদ সদস্যদের স্বার্থ বিরোধী। তবে এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত যা গণতান্ত্রিক আন্দোলন, নাগরিক সংগঠন ও সংবাদ মাধ্যমের পর্যালোচনাগুলো বিবেচনাধীন রাখবে এবং তখনই এগুলোকে সফলভাবে কার্যকর করা যাবে।

চলো এই নির্দেশিকাগুলো মাথায় রাখি। পাশাপাশি গণতন্ত্রের ঐসকল নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো লক্ষ করি। যাদের সংস্কার করা অত্যন্ত প্রয়োজন। চলো এরূপ সংস্কারের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করি।

এখানে এমন কিছু প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করা হল যেগুলোর জন্য রাজনৈতিক সংস্কার খুব প্রয়োজন। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কর। এখানে প্রদত্ত সংস্কারের বিকল্প প্রস্তাবগুলো ভালোভাবে অধ্যয়ন কর। কোন্ প্রস্তাবটিকে তুমি অগ্রাধিকার দেবে এবং এর পেছনে তোমার যুক্তিগুলো বর্ণনা কর। মনে রাখবে প্রদত্ত বিকল্প প্রস্তাবগুলোর কোনোটিই সত্য কিংবা মিথ্যা নয়। তুমি একাধিক বিকল্পও গ্রহণ করতে পার। অথবা মিশ্রণও ঘটাতে পার অথবা এমন নতুন প্রস্তাবও দিতে পার যা এখানে অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তোমার দেওয়া সমাধানমূলক প্রস্তাব এবং এর সপক্ষে যুক্তিগুলো যেন বিস্তারিত হয়।

**কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকের অনুপস্থিতির অভ্যাস সমস্যা :**

একটি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ সরকার জানতে পারল যে, গ্রামীণ এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ নিজেদের জায়গায় উপস্থিত থাকেন না। বেশিরভাগ সময় তারা শহরে থাকেন এবং ব্যক্তিগত চেম্বার পরিচালনা করেন। যে গ্রামে তারা নিয়োজিত সেখানে মাসে এক দুইবারের বেশি যান না। সাধারণ থেকে অতি সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য গ্রামীণ লোকদের শহরে আসতে হয় এবং অত্যন্ত চড়ামূল্যে বেসরকারিভাবে পরিচালিত ব্যক্তিগত চেম্বারগুলো থেকে পরিষেবা নিতে বাধ্য হয়।

**সংস্কার-প্রস্তাব:**

- সরকার এমন নিয়ম তৈরি করবে যার ফলে চিকিৎসকগণ গ্রামীণ এলাকায় তাদের কর্মস্থলে সর্বক্ষণের জন্য থাকতে বাধ্য হন। অন্যথায় চাকরি থেকে তাদের বরখাস্ত করা হবে।
- জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের উপস্থিতি যাচাই করার জন্য তাদের কর্মস্থলে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে হানা দেওয়া উচিত।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে এমন ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত যার মাধ্যমে তারা বার্ষিক প্রতিবেদনে এলাকায় নিয়োজিত চিকিৎসকদের উপস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে এবং এই প্রতিবেদনটি গ্রামসভার অধিবেশনে জনসমক্ষে পাঠ করা হবে।
- এধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে যদি উত্তর প্রদেশকে ভেঙ্গে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। কারণ ছোট ছোট রাজ্যে প্রশাসন অনেক বেশি কার্যকরী হয়।

**রাজনৈতিক তহবিল গঠন সমস্যা :**

গত লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রতিনিধিদের গড় সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি টাকারও বেশি। এটা আশঙ্কা করা হয় যে কেবলমাত্র বিত্তশালী লোকেরাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই বড়ো ব্যবসায়ী কিংবা বিত্তশালীদের প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল। এটাও আশঙ্কা করা হয় যে রাজনীতিতে অনিয়ন্ত্রিত বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবহার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের দাবীও অধিকারকে প্রবলভাবে হ্রাস করবে।

**সংস্কার-প্রস্তাব :**

- প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই জনসমক্ষে তার আর্থিক খতিয়ান প্রকাশে বাধ্য থাকবে। এই খতিয়ানগুলো সরকারি হিসাব রক্ষকদের পর্যবেক্ষণে থাকবে।
- নির্বাচনের জন্য সরকারি তহবিলের ব্যবস্থা থাকা উচিত। নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে কিছু আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- রাজনৈতিক দল ও কর্মীদেরকে নির্বাচনি অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের আরো বেশি উৎসাহিত করা উচিত। এই সকল অনুদানকে কর ব্যবস্থার বাইরে রাখা উচিত।

**তোমার পছন্দের যে কোনো বিষয়**

সমস্যা :

সংস্কার-প্রস্তাব :

- 
- 
- 

## রাজনীতির সংস্কার

শ্রেণিকক্ষের বাইরে রোজ যে কোনো ভাবে ম্যাডাম লিংডোর সাথে মিলিত হল অনেকদিন ধরেই সে কোনো একটা কিছু করার পরিকল্পনা করছিল। "ম্যাডাম, কানাডার ব্যঙ্গচিত্রটি আমার খুব পছন্দ"। আলোচনা শুরু করার জন্য রোজের এই প্রশ্নটা করা প্রয়োজন ছিল। "কোন ব্যঙ্গ চিত্রটি?" ম্যাডাম লিংডো মনে করতে পারলেন না। "ম্যাডাম, ঐ ব্যঙ্গচিত্রটি যার মাধ্যমে এটা বলা হয় যে ৯৮ শতাংশ কানাডার জনগণ মনে করেন ঐখানকার সকল রাজনীতিবিদ্‌দের একটি বাক্সে বন্দি করে নায়াগ্রা জলপ্রপাতে নিক্ষেপ করা উচিত। আমি আমাদের রাজনীতিবিদ্‌দের কথা ভাবছি। আমাদের আরো বড়ো একটি বাক্স এবং ব্রহ্মপুত্রের চেয়েও বড়ো একটি নদীর প্রয়োজন।"

রোজের দিকে তাকিয়ে ম্যাডাম লিংডো হাসলেন, অনেক ভারতীয়দের মতো ম্যাডাম লিংডোও আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ্‌দের আচরণ, রাজনৈতিক দলের পরিচালন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন রোজ যেন সমস্যার জটিলতাগুলো ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করে। তিনি প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি মনে কর চলমান রাজনৈতিক নেতাদের থেকে মুক্তি পেলেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?"

হ্যাঁ, ম্যাডাম। এই নীচুস্তরের রাজনৈতিক নেতারাই কি আমাদের দেশের যাবতীয় সমস্যার জন্য দায়ী নয়? যেমন দুর্নীতি, দলত্যাগ, জাতিবাদ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, দুর্বৃত্তায়ন ... সবকিছু।"

ম্যাডাম লিংডো: "সুতরাং আমাদের যা করা প্রয়োজন তাহল এই বিশাল সংখ্যক নেতাদের থেকে মুক্তিলাভ করা। তুমি কি নিশ্চিত যে এদের পরিবর্তে যে সকল নতুন নেতারা আসবে তারা ঐ অন্যায়গুলোর পুনরাবৃত্তি করবে না?"

রোজ: "আসলে আমি এভাবে ভাবিনি, হয়তো এভাবে কোনো সমাধান সম্ভব নয়। তবে এটাওতো হতে পারে যে আমরা ভালো নেতাদের খুঁজে পাব।"

ম্যাডাম লিংডো : "আমি তোমার সাথে এ বিষয়ে একমত যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে যদি জনগণ আরো যত্ন ও সতর্ক হন, দুর্নীতিবাজ ও অপরাধপ্রবণ নেতাদের প্রত্যাখান করে, ন্যায়পরায়ণ নেতাদের নির্বাচিত করে এবং এটাও হতে পারে যে, সকল রাজনৈতিক নেতারাই দুর্নীতিপরায়ণ নয় ...।"

"বাঁধা দিয়ে রোজ জিজ্ঞেস করল, "আপনি এটা কিভাবে বললেন ম্যাডাম।"

ম্যাডাম লিংডো : "আমি এটা বলিনি যে, রাজনৈতিক নেতারা দুর্নীতিপরায়ণ নয়। তুমি যখন রাজনৈতিক নেতাদের কথা ভাব তখন সম্ভবত ঐসব বড় বড় মানুষদের চেহারাই সামনে আসে, যাদের ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হয়। আমি অবশ্য ঐসকল রাজনৈতিক নেতাদের কথা ভাবি, যাদের সম্পর্কে আমি জানি। আসলে এ সকল নেতারা আমার সহকর্মী, সরকারি আধিকারিক, ঠিকাদার কিংবা মধ্যবিত্ত পেশাদার ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি দুর্নীতিপরায়ণ নয়। রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি বেশি দৃশ্যমান হওয়ার কারণে আমাদের মনে এধরনের ধারণার জন্ম দেয় যে সকল রাজনৈতিক নেতারাই দুর্নীতিপরায়ণ। আসলে তাদের অনেকে সত্যিই দুর্নীতিপরায়ণ। কিন্তু অনেক নেতারা এমন আছেন যারা দুর্নীতিপরায়ণ নয়।"

রোজ ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়, "ম্যাডাম, আসলে আমি যেটা চাইছি সেটা হল দেশে এমন কঠোর আইন থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে সকল প্রকার দুর্নীতি এবং জাতি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক তুষ্টিকরণের মত বদাভ্যাসগুলো সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়।"

ম্যাডাম লিংডো: "রোজ, আমি নিশ্চিত নই। ধর্ম এবং জাতিভিত্তিক ও তুষ্টিকরণে রাজনীতি নির্মূল করার মত আইন আমাদের সমাজে আগে থেকেই প্রচলিত আছে। রাজনৈতিক নেতারা এসকল আইন এড়িয়ে যাওয়ার পথ খোঁজার চেষ্টা করে। কোনো আইন ততক্ষণ পর্যন্ত ফলপ্রসু হয় না যতক্ষণ সাধারণ জনগণ ধর্ম এবং জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক বিভাজন এবং বিভ্রান্তমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে না ওঠে। তুমি প্রকৃত গণতন্ত্র খুঁজে পাবে না যদি জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক নেতারা একসাথে মিলে ধর্ম এবং জাতিগত বৈষম্য অবসানের চেষ্টা না করে।"

## গণতন্ত্রের নতুন সংজ্ঞা (Redefining democracy)

গণতন্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে গতবছর থেকে আমরা এর অধ্যয়নের যাত্রা শুরু করেছি। তুমি কি সেই সংজ্ঞাটি মনে করতে পার? এটা গত বছরের পাঠ্যবই-এ দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন গণতন্ত্র হল এমন সরকার ব্যবস্থা যেখানে শাসকগণ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। এরপরে আমরা এই সম্পর্কিত কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছি এবং এই সংজ্ঞাকে সামান্য বিস্তার করেছি। গণতন্ত্রের কিছু যোগ্যতামান নিম্নরূপ —

- জনগণ দ্বারা নির্বাচিত শাসকগোষ্ঠী অবশ্যই সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- নির্বাচন ব্যবস্থায় চলমান শাসক গোষ্ঠীকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ন্যায্য সুযোগ ও পছন্দ অনুযায়ী বিকল্পের ব্যবস্থা থাকবে।
- এধরনের বিকল্প পছন্দ এবং ন্যায্য সুযোগ সমতার ভিত্তিতে সকলের জন্য উপলব্ধ থাকবে।
- এধরনের বিকল্প অনুসরণ এমন এক সরকার গঠনে সাহায্য করবে যা নাগরিক অধিকার এবং সাংবিধানিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে।

তুমি হয়তো হতাশ হবে এই জন্য যে, গণতন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যায় কোনো দার্শনিক মতবাদকে যুক্ত করা হয়নি। আসলে গণতন্ত্রের প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা ইচ্ছে করেই অল্পস্বল্প অথচ স্পষ্ট সংজ্ঞাটি প্রদান করেছি। এই সংজ্ঞাটি আমাদের গণতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নিরূপণে সাহায্য করেছে।

তুমি এটাও পরবর্তীতে লক্ষ করেছ যে, গণতান্ত্রিক সরকার এবং রাজনীতির বিভিন্ন দিকের উপর দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা পূর্বের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে আরো অনেকদূর এগিয়ে গেছি।

- গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি এবং লক্ষ করেছি যে এই অধিকারগুলো শুধুমাত্র ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার, রাজনৈতিক সংগঠন করার অধিকার ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের কথাও আলোচনা করেছি।
- গণতন্ত্রের আলোকে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের বিষয়টিও আমরা এনেছি। সরকারের বিভিন্ন স্তর ও সামাজিক গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারেও যথাসম্ভব আলোচনা করেছি।
- আমরা এটাও দেখেছি যে কেন গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হতে পারে না। পাশাপাশি আমরা দেখেছি সংখ্যালঘুদের দাবী দাওয়ার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া গণতন্ত্রের জন্য কেন প্রয়োজন।
- গণতন্ত্রের উপর আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র সরকার এবং তার কার্যপ্রণালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যে ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য নির্মূল করা গণতন্ত্রের জন্য কেন অত্যাবশ্যক।
- পরিশেষে আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে একজন ব্যক্তি মানুষ কি ধরনের ফলাফল প্রত্যাশা করে সেই সম্পর্কেও আলোকপাত করেছি।

এসকল করার মাধ্যমে আমরা বিগত বছরের পাঠ্যবই-এ প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞার বিরুদ্ধে যাইনি।

আমরা এমন একটি সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করেছি যা ন্যূনতমভাবে গ্রহণের কারণে একটি দেশকে গণতান্ত্রিক দেশ বলা যায়। আলোচনাকালে আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতামানের কথা বলেছি। গণতন্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি।

একটি উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রকে আমরা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি? কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকলে পরে উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র বলা যায়? উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রে কী কী বিষয় থাকা উচিত নয়? এবিষয়ে তুমি সিদ্ধান্ত নাও।

***গভীরভাবে অধ্যয়ন***

© Ares - *Best Latin America*, Cagle Cartoons Inc.

নীচের খালি জায়গায় উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র সম্পর্কে তোমার নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য দেওয়া হল।

এখানে তোমার নাম লেখ .................................. উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রের সংজ্ঞা
(৫০টি শব্দের অধিক নয়)

বৈশিষ্ট্যসমূহ (যতবেশি পার তোমার মতামত দাও। এগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যায় নিয়ে আস)।

১)

২)

৩)

৪)

৫)

৬)

এই অনুশীলনীটি তোমার কেমন লাগল? কোনটি তোমার বেশি পছন্দ হয়েছে? এর চাহিদা কি খুব বেশি? সামান্য হতাশাজনক? এবং কিছুটা ভীতিজনক? এই কাজটি সমাধানে পাঠ্যবইটি তোমার জন্য বেশি সহায়ক হয়নি, একারণে কি তুমি অসন্তুষ্ট? তোমার দেওয়া সংজ্ঞাটি সঠিক নাও হতে পারে এজন্য কি তুমি চিন্তিত?

গণতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার এটাই তোমার পাঠ শেষ। আসলে উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রের কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। একটি উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র এমনই যেমন আমরা ভাবি। অথবা যেভাবে আমরা এটাকে প্রস্তুত করতে চাই। এ কথাগুলো শুনে হয়তো তুমি অবাক হবে। তবে এটাও ভাব: উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র কি এব্যাপারে কেউ যদি আমাদের উপর কোনো ধারণা চাপিয়ে দেয় তাহলে তা কি পর্যাপ্ত গণতান্ত্রিক হবে?